সাহিত্য মালিকা

কবিতা মঞ্জরী

আত্মসমীক্ষণ	উত্তম কুমার বণিক
দাঁড়াও পথিক	সুপ্তি বসু
রাই কিশোরী	শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়
প্রার্থনা	উত্তম কুমার বণিক
সংসার অসার	শ্রীমতী শুক্লা দে
একলা মা	সুস্মিতা নন্দী
প্রাপ্তি এবং পাওনা	সুস্মিতা মুখার্জ্জী
পুজোর খুশির সাধ না মেটে	অয়ন্তিকা মুখার্জ্জী
বিসর্জনের স্বপ্ন	সৈকত মিত্র
পুজোর কবিতা	মধুমিতা মুখার্জ্জী
ঠিকানা : দিকশূন্যপুর	দিবাকর পুরোকায়স্থ

গল্পগুচ্ছ

ক্যাবলাকান্তের দপ্তর	পুণ্যজিৎ গুপ্ত
মরণের ওপারে	শ্রীমতী শুক্লা দে
রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী	দিলীপ চক্রবর্ত্তী
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে	উত্তম কুমার বণিক
হে কবি প্রণমি তোমায়	জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)
ক্লোজ এনকাউন্টারস – ফোর্থ কাইন্ড	পুণ্যজিৎ গুপ্ত

রান্নাঘর

কাঁচা পেঁপের শুক্তো	শ্রীমতী মালা রায়
কাঁচালংকা মুরগি	জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

আত্মসমীক্ষণ

উত্তম কুমার বণিক

কেন মানুষের মধ্যে দেখা যায়
এখনও এই প্রবণতা -
'আমি যাহা করি, তাহাই শ্রেয়' ?
কেন প্রয়োজন হয়, করতে অন্যকে হেয়?

কেন মনের মধ্যে পায় না স্থান,
অন্যের জন্যে একটু উদারতা?
কেন প্রকাশ করতে হয়,
মনের অবাঞ্ছিত মলিনতা?

কেন দেখা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার সুপ্রতিফলন,
কিছু মানুষের আচরণে?
কেন পীড়িত হতে হয় আপনজনদের অকারণে?
কেন বিরত রাখে নিজেকে, করতে আত্মসমীক্ষণ?

কেন কটু কথায় করতে হয়,
অন্যকে অযথা দোষণ?
কে জাগাবে,
এই মানুষদের শুভ চিন্তন?

প্রার্থনা করি, অচিরেই যেন হয়,
এদের মানসিকতার পরিবর্তন।
দিয়ে মনের সংকীর্ণতার বিসর্জন,
হোক শুভবুদ্ধির উন্মোচন।

* * * * *

দাঁড়াও পথিক

সুপ্তি বাসু

"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?
সেই যে তোমার চলার শুরু
পেছন পানে তাকাও নি
অন্তরালে কার যেন সেই যুগল ভুরু
দৃষ্টি ভেজা হরিণ চোখে
তার সে ভাষা বোঝায়নি।

দাঁড়াও পথিকবর, একটু শোনো
তুমি কি শুধুই গদ্য রচনায়?
অন্তঃপুরবাসীর স্থান নেই কোনো
তুমি কি শুধুই লেখকের ভাবনায়?

তোমার পথ চলা হয় নি ক্ষান্ত
ভরেছ ঝুলি সুখদুঃখের অশ্রুবিন্দু দিয়ে
বসেছো ছায়াতরুতলে যখন তুমি ক্লান্ত
চলেছো অন্তবিহীন বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে।

কখনো কি মনে হয়নি কভু
কে যেন এসে দাঁড়ায় তোমার তরে?
তৃষিত হয়ে দেখেছি তবু
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
ওগো পথিক তুমি
কোন্ পথে যে চলো
বসে আছি নীরব আঁধারে
পথ পানে চেয়ে চক্ষু ছলো ছলো
তুমি দুরাশা, আঘাত করেছো হৃদয়- দুয়ারে।

কেউ বা তাকায় তোমার তরে
তুমি চলো আপন মনে
দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে
বাস কোথা যে কে জানে।
তুমি চলে যাও তোমার পথে
নিয়ে থাকি বেদনাভরা মন
কখনো যদি থমকে দাঁড়াও যেতে
পথের প্রান্তে এসে দাঁড়াবো স্বল্পক্ষণ।

* * * * *

রাইকিশোরী

শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়

নিদ্রাহীন রাত কাটে মোর কদম ফুলের গন্ধে,
নাচের তালে মনটি দোলে শ্রাবণ নূপুর ছন্দে।
রাইকিশোরীর কথা পড়ে মনে বর্ষামন্দ্রিত রাতে,
অভিসারে চলে বংশী শুনে তারই কানহার সাথে।

আজকের রাই পারবে কি যেতে এমন গভীর রাতে?
কপালে জুটবে ধর্ষণ আর মৃত্যু অপঘাতে।
মনুষ্যত্ব হারিয়ে কানহারা বনের পশু সাজে
মা বোনের কথা ভুলে যায় তারা - কী ঘটে মনের মাঝে?

চারিদিকে দেখ হিংসা দ্বেষ নোংরামিতে ভরা
এরমাঝে কি ভালো আছে মা বসুন্ধরা ।
সর্বদা ভয়, কি হয়, কি হয়, দিন যেন কাটে ভালো
তারই মাঝে রবীন্দ্রনাথ ঘুচায় মনের কালো ।

আজও আমি গেয়ে চলেছি তার শ্রাবণের গান
কদম কেয়ার গন্ধে সাঙ্গ হল মোর মান অভিমান।
এই নৃশংস পুরুষেরা যদি পারতো তোমায় জানতে
লজ্জায় তারা মরে যেত তখন এমন কাজটি করতে।

মনে হয় কেবল সবারে ডেকে তোমার কথা বলি,
তোমার চেতনা তোমার ভাবনা তোমারেই ধরে তুলি।
ওদের বিবেক জাগিয়ে তুলে পশুত্বকে মারো
নরনারী সবাই মিলে এই ব্রত গ্রহণ করো।

পশুর বুদ্ধি না - মানুষের বুদ্ধি, কার বুদ্ধি বড় ?
সুন্দর হোক ধরিত্রী আজ এই শপথ করো।

* * * * *

প্রার্থনা

উত্তম কুমার বণিক

জীবনের সায়াহ্নে এসে
প্রশ্ন জাগে মনে,
আগামী দিন গুলো,
কাটবে তো, এমনি সুস্থ দেহ সনে?

নিজের অজান্তে মনে পড়ে,
ছেলেবেলার কত কথা,
কত শত সুখ স্মৃতি,
যেন হাজারো গল্পের গাঁথা!

শরতের হিমেল পরশে,
দু'নয়ন হয়ে উঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন।
কৈশোর- যৌবনের মধুময় স্মৃতিগুলো,
করে তোলে মনটাকে সুপ্রসন্ন।

এক নির্বাক প্রার্থনা স্থান পায়
মনের কোণে, নিজের অজান্তে,
জীবনের আগামী দিনগুলো যেন
কাটে সুখে আর শান্তিতে।

* * * * *

সংসার অসার

শ্রীমতী শুক্লা দে

নগরের প্রান্তভাগে বৃক্ষ তলে আসি
বসিইয়াছে সৌম্য মূর্ত্তি প্রবীন সন্ন্যাসী
মস্তকের দীর্ঘ কেশে জটাজুট ভার
দীর্ঘ শ্মশ্রু ঢাকিয়াছে আনন তাঁহার
সম্মুখেতে কমণ্ডলু জলে ভরি রাখি
করিছে তপস্যা ধ্যান মুদি দুই আঁখি
দলে দলে গ্রামবাসী করে আগমন
ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর বন্দিল চরণ
জানাইল যুক্ত করে, ‘সার তত্ত্ব কথা
শুনিবারে হৃদয়েতে বাড়ে ব্যাকুলতা।’
সন্ন্যাসী কহিল, ‘তবে শুন মন দিয়া
বহু বর্ষ এই বেশে পৃথিবী ঘুরিয়া
পাইনু অমূল্য রত্ন সর্ব তত্ত্ব সার
মায়া মোহ ভরা এই সংসার অসার।’

* * * * *

একলা মা

সুস্মিতা নন্দী

আমার মা, সর্বমঙ্গলার কোল ঘেঁষে দাঁড়াই।
যে কিনা প্রতিবেশীর দুয়ারে শ্রম বিলিয়ে
মুখে তুলে দেয় ধান্যমঞ্জরী।

পিতা অসমাপ্ত সংসার ফেলে
জনপথে ভেসে গেছেন উজানের গাঙ্গে
তবুও মায়ের সিঁথিতে মোরগঝুটির ফুল।
তবুও মা – বৈশাখের ঘূর্ণিঝড়ে
কোচর ভরে আম কুড়োয়
জর্জরিত শীতে চাদর ঢেকে
আমায় বর্গিদের গল্প শোনায়
কোনো এক কুয়াশাহীন কালীদহে
বেহুলার ভেলা ভাসায়।।

* * * * *

প্রাপ্তি এবং পাওনা

সুস্মিতা মুখার্জ্জী

প্রাপ্তি এবং পাওনা
কক্ষনো মে- লে- না।
ভাবছি যে- টা, বলবো কি তা?
সত্যি কথা সয় না।
প্রাপ্তি এবং পাওনা
চাইছি যেটা পাচ্ছি কোথা?
কভুই যে তা হয় না -
প্রাপ্তি এবং পাওনা।
ভাবছি শুধুই, মিলছে কতই?
কিন্তু কিছুই মিলছে না;
সবই আছে, কিছুই যে নেই
এক ধাঁচেতে পড়ছে সবাই
চাওয়া পাওয়া, পাওনা দেনা -
আশানুরুপ হয় না।
আসছে ঘুরে একই পথে,
প্রাপ্তি এবং পাওনা।।

* * * * *

পুজোর খুশির সাধ না মেটে

অয়ন্তিকা মুখার্জ্জী

দিন কেটে যায় যাচ্ছে কেটে থাক না যতই আড়ি বা ভাব
পুজোর খুশির সাধ না মেটে।
ভাজা আর চা খাচ্ছে চেটে মিটিং ইটিং টাকার হিসাব
চাঁদা তোলা চলছে রেটে।।

ব্যানার, স্টল, স্যুভেনিয়র- ফ্রন্ট বা ব্যাক, হাফ না ফুল
কভার পেজ, টপিক ছাপা
বাংলা বা ইংলিশ; সাবস্ক্রিপশান ডোনেশন
স্পনসরশিপ ফুলে ফাঁপা।

শুধুই কি তাই? হিসাব- কিতাব তার কি হবে?
ভা- ব- ছো টা কি?
মোটা খাতা পেনের খোঁচা ল্যাপ্‌টপেতে বোঝাই ব্যাগ
দে- খ- ছো না কি?

ভোগের জোগাড় কাজের মানুষ অঞ্জলিতে লম্বা লাইন
ফুল দেওয়া আবার ফলও কাটা;
অন্যদিকে, গান- কবিতা- ফ্যান্সী ড্রেসের প্রতিযোগিতা
জমছে তো বেশ, সবটা!

সন্ধ্যে বেলার অনুষ্ঠানে জাঁক- জমক আর ড্রেসের বাহার
ছোট- বড়, যুবা- বুড়ো, বাংলা আর বাঙ্গালিয়ানা
দিনে রাতে চলছে হেথায়, পুজোর খুশি পুজোর মজায়
চারটি দিনের আনন্দেতে স্বর্গসুখের পরোয়ানা।

* * * * *

বিসর্জনের স্বপ্ন

সৈকত মিত্র

ঢাকের সুর মিলিয়ে গেল দূরে
পথের শেষে সেই আলসুরে।
এনজিআর এর দরজাটা আজ বন্ধ
শুধু রয়ে গেল পচা ফুলের গন্ধ।
আজ বড় দুখের দিন
বিজয়ার সুর মা বিহীন।

কিন্তু অন্য কোথাও অন্য কোন খানে
ছউ নাচের মরদ ঘরে ফেরে মাটির টানে।
পুরুলিয়ার ওই লাল মাটির দেশে
আনন্দ আজ উপছে পরে এসে।
“বাবা এসেছে বাবা এসেছে” বলে
আদুল গায়ে দৌড়ে আসে ছেলে।
ছুটে আসে যে যার কাজ ফেলে
উনুন ধারে মুখ মুছে আঁচলে
ধীর পায়ে সেও এগিয়ে চলে।
বাজনা, মুখোশ নামিয়ে রেখে পাশে
ঝোলা খুলে গোল হয়ে সব বসে।
বড় মেয়েটার জন্য জামা ফিতে সব লাল
ছোটোর ঝুন ঝুনি, মেজোর ফুটবল, বউ এর শাল।
ওদের যে আজ , দুঃখ ভোলার মন
হোক না পূজা শেষ, হোক না বিসর্জন।
চাই না পুজো, এমন বিসর্জনই ভাল
বাবা এলে সবার মনে কত আশার আলো।
বাচ্চারা সব দৌড় দিল যে যার জিনিষ নিয়ে
শুধু দুজন বসে থাকে দু চোখে তাকিয়ে।
জীবন মানে একটু সুখ, একটু মিষ্টি হাসি
জীবন মানে মনের মাঝে স্বপ্ন রাশি রাশি ।

এমন পুজো আবার যেন বছর বছর আসে
আমরা সবাই থাকতে পারি এদের সবার পাশে।

* * * * *

পুজোর কবিতা

মধুমিতা মুখার্জ্জী

বৃষ্টি শেষের রোদ্দুরে ,
এবার ঢাকের কাঠি পড়ে।
একটা যুগ শেষ হয়,
আর একটা যুগ গত হবে বলে।
সময় এগিয়ে চলে, তবু ফিরে দেখা,
সবুজ ঝরনায় নিজেকে ভিজিয়ে নেওয়া।
এই চারটি দিনের সুরে
শিউলি ফুটবে বলে।
কত বাঁধন খুলে যায়,
বাঁধন ছিঁড়ে যায় শেষ বারের মতো।
মণ্ডপে নতুন বাঁশ পড়ে,
গিঁট বাঁধা হয় শক্ত করে।
নতুন মুখগুলো পুরোনো হয়ে যায়,
ফিরতে পারে না আর ব্যস্ততার চাপে,
তবু নতুন সুর রাঙ্গা হয়ে আসে
আবার দেখা হবে বলে।

* * * * *

ঠিকানা : দিকশূন্যপুর

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে)

দিবাকর পুরোকায়স্থ

আজ বর্ষশেষ, হে অতীত -
আমরা তোমাকে খুঁজতে যাব আবার
দিকশূন্যপুরে -
কিন্তু, নীরা যে এখনো এলোনা
নীরা ... নীরা ... বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস
দিগন্তের জানালায় করে ফিস্‌ফাস্‌
উদ্দাম বাতাস আর নিঃশব্দ আকাশ
বলে যায় ব্যর্থ হাহাকারে
নীলু যে ঘুমিয়ে পড়েছে তার
দিকশূন্যপুরে -
আজ তার ঠিকানা শুধু মহাবিশ্ব।
শুধু একটা এফিটাফ! হে কৃত্তিবাস
আজ শুধু শূন্যতা এই
দিকশূন্যপুরে -
শুধু একটা আশা জেগে থাকে অপেক্ষায়,
হয়ত নীলু আসবে আবার -
“হঠাৎ নীরার জন্য।”

* * * * *

ক্যাবলাকান্তের দপ্তর

পুণ্যজিৎ গুপ্ত

বাঙালী জাতির বড়ই দুর্দিন।

ইহা অবশ্য নতুন কথা নয়। বিগত পাঁচ দশক ধরিয়া একই আর্তনাদ বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। সকলেই একমত যে ইহার প্রতিকার একান্তই আবশ্যক। এই পরিস্থিতি লইয়া দেশের কোলাহলের শেষ নাই। সবাই আলোচনায় মুখর। সভা, সমিতি, আলোচনাচক্র, রেডিও ও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠানে সর্বত্রই একই চর্চা। কাপের পর কাপ চা উড়িয়া যাইতেছে, প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস হইতেছে, বাঙালীর আলোচনায় বিরতি নাই। দেশের বাকী লোক বিস্ফারিত নয়নে দেখে - তাহাদের স্থূলবুদ্ধিতে প্রশ্ন জাগে এত কথা না বলিয়া কিছু কাজ করিলে হয়ত অবস্থার কিছুটা বিহিত হইত। বাঙালী ভ্রূক্ষেপ করে না। সে জানে কাজকর্ম ইত্যাদি উদ্ভট ব্যাপার পাঞ্জাবী- মারোয়াড়ীদের কর্তব্য। কাজকর্ম করিয়া ইহারা প্রচুর পয়সাকড়ি ও বাড়ি গাড়ির মালিক হইয়াছে বটে, ইহাদের সন্তানসন্ততিরা ভাল ভাল স্কুল কলেজে স্থান পাইয়াছে, ভাল চাকরি বা ব্যবসা করিতেছে ইহাও ঠিক - তবে তাহাতে কি আসে যায়? বুদ্ধিতে, তর্কে বাঙালীর সাথে পারিবে কি ? এত জেনারেল নলেজ তাহাদের আছে কি? অবান্তর কথায় কান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, সব সমস্যার সমাধানকল্পে আধুনিক যুগে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কমিটি বা কমিশন গঠন। তর্কবিতর্ক, বাকবিতণ্ডা এবং আলোচনাকে সংগঠিতভাবে চালনা করাই ইহার কর্তব্য। এই পদ্ধতিতে প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হইয়াছে - পরোক্ষভাবে। কেন না যতদিন ধরিয়া কমিশন চলিয়া থাকে, সমস্যার আয়ু তাহা হইতে বহুলাংশে হ্রস্বতর। অর্থাৎ সমস্যার ন্যাচারাল ডেথ হইয়া সমস্যার অস্তিত্বই লোপ পায়। যথার্থ কারণেই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জনপ্রিয় হইয়াছে।

বাঙালীও কমিশন গঠন করিল। একসদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের দায়িত্ব কি তাহা লইয়া নির্বোধের মত প্রশ্ন তুলিবেন না। নতুন সমস্যার উৎপত্তি হইবে।

ক্যাবলাকান্ত এই কমিশনের একমাত্র সদস্য। অবশই প্রশ্ন তুলিবেন যে ক্যাবলাকান্তের পরিচয় কি? ইহা সাংবিধানিক প্রশ্ন - সুতরাং উত্তর পাইবেন।

কমলাকান্তকে মনে পড়ে কি ? মনে দ্বন্দ্ব থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক পুরুষ বিশেষের নাম স্মরণ করুন - এবং তাঁহার দপ্তরীকে। যাহারা এখনও গ্রীবাদেশ চুলকাইতেছেন, তাহারা অনর্থক কালক্ষেপ করিবেন না। এই প্রবন্ধ তাহাদের না পড়িলেও চলিবে।

ক্যাবলাকান্ত এই কমলাকান্তেরই বংশধর। দেহ এতই ক্ষীণ যে দেখিলে অড্রে হেপবার্ন হিংসায় জ্বলিয়া যাইতেন। বক্ষদেশে সর্বদাই অগ্নিদেব বিরাজমান। উদরদেশে যে কোন মুহূর্তে সন্ধান চালাইলে লিটার তিনেক চা পাওয়া যাইবে। ভুলক্রমে শ্বাসনালীতে ঢুকিয়া পড়িলে চারমিনারের ধোঁয়ায় পথ হারাইবেন। আর মস্তিষ্কের কোষে কোষে কার্ল মার্কস, সত্যজিৎ রায় এবং বাইচুং ভুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সর্বাধিক মারাত্মক ক্ষেত্র মুখগহ্বর। তথায় অবস্থিত রহিয়াছে সিকন্দরের তরবারিসদৃশ শাণিত অস্ত্র। ইহার বলেই ক্যাবলাকান্ত বলীয়ান।

ক্যাবলা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়াছে। তাহার থিয়োরী অনুযায়ী বিগতযুগের গণ্যমান্য বাঙালী মহাপুরুষরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। ইহারা বিভিন্ন সময়ে মতামত ও মার্গ দর্শন এই সরল জাতটির উপর ঝাড়িয়াছেন। ফলতঃ বিভিন্ন পথের গোলকধাঁধায় বাঙ্গালী আজও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ভুলভুলাইয়া হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইলে

প্রথমে জানা দরকার কোনটি সঠিক রাস্তা আর তাহা করিবার নিমিত্ত আশু আবশ্যক এই মহাপুরুষদিগের সহিত ইন্টারভিউ এবং আলোচনা। বিধিমত জীবিত বা মৃত যে কোন ব্যক্তিকে জেরা করিবার সাংবিধানিক অধিকার কমিশনের আছে। এই অধিকার পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিতে ক্যাবলাকান্ত তৎপর হইল।

প্রথম প্রয়োজন এই সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করা নচেৎ ইন্টারভিউতে ব্যুমেরাং হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সময় সংক্ষিপ্ত। ভুল বলিলাম, সময়ের অভাব নাই, অভাব ধৈর্যের। সুতরাং কলেজ স্ট্রীট হইতে 'বাঙালী রবীন্দ্রনাথ', 'মানুষ বিবেকানন্দ', 'ছোটদের নেতাজী' ইত্যাদি কনডেন্সড ভল্যুম জীবনকাহিনী পাইকারী দরে খরিদ করিল। অতঃপর সাড়ে তিনশো কাপ চা এবং সাড়ে তিনশো চারমিনারের সহযোগে এইসব পুস্তক চর্বিতচর্বণ করিল। সাড়ে তিনদিন পর ঘর হইতে যখন বাহির হইল তখন ক্যাবলাকান্ত একটি চলমান বঙ্গকোষ। অবশ্যই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

পরবর্তী কর্তব্য এই সব মহাপুরুষদের দর্শন করিয়া ইন্টারভিউ লওয়া। ইহার নিমিত্ত যাইতে হইবে স্বর্গলোকে। কিভাবে ক্যাবলা স্বর্গলোকে গমন করিল ইহা লইয়া বেয়াড়া প্রশ্ন তুলিবেন না। প্রথমত: আজকাল সরকারী চিকিৎসালয়ের কর্মতৎপরতায় স্বর্গদর্শন সহজ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত: গল্পের গরু গাছে উঠিতে পারে, ক্যাবলাও স্বর্গে উঠিতে পারে।

- ২ -

স্বর্গে আসিয়া ক্যাবলাকান্তর উপলব্ধি হইল ইহা হইতে নীরস জায়গা কল্পনাতীত। কোথাও কোন চাঞ্চল্য, কোলাহল, বিবাদ, তর্কবিতর্ক ইত্যাদির লেশমাত্র নাই। বোটানিক্যাল গার্ডেনের মত সুবিস্তৃত নন্দনকাননে যুবকযুবতীর ভিড় নাই - ঝালমুড়ি, আইসক্রিম ও পেপসির স্টল নাই। পিকনিক পার্টি নাই। রাস্তাঘাটে ট্র্যাফিক জ্যাম নাই। আবহাওয়া দিনরাত্রি সংবৎসর একই প্রকার। ঝড়, বৃষ্টি নাই, রৌদ্রের তাপ নাই, শীতের হিমপ্রবাহ নাই। তাপমান বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে বাঁধা। ইহার কারণে স্বর্গবাসীদের মগজের টেম্পারেচারও এক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত না হইলে বিবাদ কোলাহল হইবে কি করিয়া। সর্বাধিক অভাব লোডশেডিংএর। ক্যাবলাকান্তর অস্বস্তি হইতে লাগিল। একেবারে প্রাণহীন জায়গা। অবশ্য প্রাণ লইয়া স্বর্গলোকে আসা যায় না।

ক্যাবলার নামের লিস্টিতে নেতাজী, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সবার উপরে। প্রয়োজনমত বাকীদেরও সাক্ষাৎকার নেওয়া যাইবে। ক্যাবলা ইহাদের সন্ধানে বাহির হইল।

প্রথম নেতাজী। তিনি নন্দনকাননের একপ্রান্তে সামরিক পোশাকে কুচকাওয়াজ করিতেছিলেন। টেপরেকর্ডারে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' বাজিতেছিল।

ক্যাবলা সময় নষ্ট করিল না। সোজা নেতাজীর সামনে উপস্থিত হইল।

'বাঃ, আপনি এখানে? বিগত পাঁচ দশক ধরিয়া বাঙালী আপনার খোঁজে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক করিতেছে - আফগানিস্তান, জার্মানি, জাপান এবং বর্মামুলুক চষিয়া ফেলিতেছে আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে কুচকাওয়াজ চালাইয়া যাইতেছেন! এই তথ্য অবগত থাকিলে কয়েক বৎসর শৌলমারির সাধুকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করা হইতে দেশবাসী তো অন্তত: অব্যাহতি পাইত।

এত দ্রুত আক্রমণ ব্রিটিশ ফৌজের থ্রি নট থ্রি রাইফেলেরও ক্ষমতায় কুলাইত না। নেতাজী সঙ্গত কারণেই হকচকাইয়া গেলেন। এই যন্ত্রটি কি এবং কোথা হইতে আমদানী হইয়াছে জানা দরকার। প্রশ্ন করিলেন 'তুমি কে ?'

'আমার পরিচয় জানিয়া আপনার লাভ নাই। আমাসদৃশ কয়েক কোটি বঙ্গসন্তানের প্রতিভূ হইয়া আমি আসিয়াছি, আপনাকে প্রশ্ন করিতে। আপনার বাণী লইয়া দেশবাসী আজও ধন্ধে রহিয়াছে - 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি

তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিব।' কতটা রক্ত প্রয়োজন, কোন ব্লাডগ্রুপের, কোন ব্লাডব্যাঙ্কে দিতে হইবে, কোন ডিটেলস এর উল্লেখ নাই। এইরূপ গোলমেলে ডায়লগের অর্থ কি?

স্বর্গরাজ্যের সমস্ত ডিসিপ্লিন ভুলিয়া নেতাজীর হস্ত নিসপিস করিতে লাগিল। পার্শ্বস্থিত রাইফেলের দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে তাকাইলেন। পরিশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার বক্তব্যের সারমর্ম বুঝ নাই। আসলে রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা - আঃ কি জ্বালাতনে পড়িলাম। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখার প্রয়াস কর। এঁড়ে তর্ক পরে করিও।'

'প্রভু, কিছু মনে করিবেন না। যুদ্ধের উত্তেজনায় আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি একটু গুলাইয়া গিয়াছিল। বাঙালীর নিকট চাহিলেন রক্ত? সমস্ত রক্ত মশককুলের উদরস্থ। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করিলে দেশ প্রতি দেড় সপ্তাহ অন্তর ম্যালেরিয়ার ধাক্কায় পড়িত। এইসব ভাবিয়াছিলেন?

'নেতাজীর সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চক্ষু ঘূর্ণায়মান। অবস্থা দেখিয়া ক্যাবলা আর ঘাঁটাইল না। স্বামী বিবেকানন্দের খোঁজে প্রস্থান করিল।

- ৩ -

স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে ক্যাবলার ফান্ডা ভাসাভাসা। এই মহাপুরুষটি কিঞ্চিত গোলমেলে। মোটামুটি যাহা বুঝিয়াছে তাহা হইল যে ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বড়ই পেয়ারের শিষ্য ছিলেন। একবার মার্কিনমুলুকে গিয়েছিলেন এবং 'প্রিয় ভাতা ও ভগিনীগণ' সম্বোধন করিয়া সাহেব ও মেমদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার ছবিতে প্রায়শই হাতে একটি লাঠি দেখা যায়। এই লাঠিটি আপাতদৃষ্টিতে পর্যটকদের সঙ্গী বলিয়া বোধ হইলেও ইহার অন্যান্য ব্যবহারের সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষত: লাঠিটি বড়ই মজবুত চেহারার। অন্য একটি ছবিতে অবশ্য লাঠি অনুপস্থিত। সেখানে স্বামীজী বাহুবদ্ধ অবস্থায়। ক্যাবলা স্থির করিল স্বামীজীর হাতে লাঠি থাকিলে ইন্টারভিউ বিপজ্জনক হইতে পারে - সুতরাং লাঠিরহিত অবস্থায় স্বামীজীকে ধরিতে হইবে।

ক্যাবলার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। স্বামীজী একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর আসীন ছিলেন - চক্ষু নিমীলিত এবং বাহুবদ্ধ অবস্থায়। লাঠি দৃশ্যমান ছিল না। স্বাভাবিকভাবে ক্যাবলার সাহস ও পরাক্রম বাড়িল। ইন্টারভিউ শুরু করিয়া দিল।

'আপনার কয়েকটি বাণী লইয়া প্রচুর গণ্ডগোলের উদ্ভব হইয়াছে। আমি সে ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করিব।

স্বামীজী প্রস্তরাসন হইতে ভূপতিত হইতে হইতে কোনক্রমে সামলাইয়া লইলেন। ধ্যানভঙ্গ হওয়ামাত্র ক্যাবলাকান্তর দর্শনে যে সামান্য ভিসুয়াল শক সৃষ্টি হয় তাহাতে ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক স্বামীজী অসীম মনোশক্তির অধিকারী। তাই নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন - 'কোন্ বাণীর মর্মার্থ বুঝ নাই ?'

- 'মর্মার্থ না বুঝিবার ব্যাপার নহে। গণ্ডগোল অন্যত্র। আপনার বাণী ডিফেকটিভ।'

- 'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বলিয়া গেলেন 'তোমরা গীতাপাঠ ছাড়িয়া ফুটবল খেল,' পরিণতি হইল এই যে সপ্তকোটি বঙ্গসন্তান পরমোৎসাহে ময়দানে কাদা মাখামাখি শুরু করিয়া দিল। গোটা দেশ ঘটি ও বাঙালে বিভক্ত হইল। কখনো ইলিশ মাছ ও কখনো চিংড়িমাছের বাজারদর আকাশছোঁয়া হইল। ত্র্যহস্পর্শ পূর্ণ করিতে একটি যবনক্লাবও ভিড়িয়া গেল। প্রচুর কোচ,

প্রচুরতর প্রথা ও ছক আমদানী করিয়া ফেলিল। ফলাফল অষ্টরম্ভা। কেন না বাঙালীর অ্যাভারেজ ওয়েট পঞ্চাশ কেজি। এই ওজন লইয়া লুডো খেলা সম্ভব। ফুটবল নয়। ভট্ করিয়া কিছু বলিবার আগে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই? আপনার এই বাণীর ফলে বাঙালী না করিল গীতাপাঠ আর ফুটবলের কথা তো বলিলাম। এক কাপ চা পাওয়া যাইবে কি? অনেকক্ষণ বকবক করিলাম।'

অবলম্বন ব্যতীত স্বামীজীর পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা আর সম্ভব হইল না। নিজের লাঠির কথা স্মরণ করিলেন। মন্ত্রবলে নিমেষের মধ্যে লাঠির আবির্ভাব ঘটিল। তাহা হইতে দ্রুতবেগে ক্যাবলা অদৃশ্য হইল।

- ৪ -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ক্যাবলার জ্ঞান সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তাঁহাকে ক্যাবলা সর্বশেষে রাখিয়াছে। এবং তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে তাহাও নিজের আই কিউ। খাটাইয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। বস্তুতপক্ষে ক্যাবলা নির্ভুল প্রমাণিত হইল। গুরুদেবকে আবিষ্কার করিল মা সরস্বতীর আশ্রমে।

মা স্নান সমাপ্ত করিয়াছেন। বিশ্বকর্মাকে বুঝাইতেছেন যে বীণাটির সার্ভিসিং প্রয়োজন। দুই চারিটি তার বেসুরে বাজিতেছে। পালিশও চটিয়া গিয়াছে। হাঁসটি খুট খুট করিয়া গুগলী শামুক খুঁটিয়া খাইতেছে। গুরুদেব আঙিনায় আরামকেদারায় রিল্যাক্স করিতেছেন।

ক্যাবলা গুরুদেবের সামনে উপস্থিত হইল। 'স্যার কয়েকটি প্রশ্ন করার ছিল।'

গুরুদেব উত্তর দিলেন না ।

'আমি বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছি, 'বাঙালীর সমস্যা কমিশনের সদস্য ও প্রতিভূ হিসাবে।'

গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

'আপনি বাঙালী জাতকে ম্যাক্সিমাম কনফিউজড করিয়াছেন। তাই আপনাকে জেরা করিতে আসিয়াছি।'
গুরুদেব হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

'আপনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লাইনে কথাবার্তা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে বহুলাংশ আবার সুরে বাঁধিয়া। কখনো বলিয়াছেন ঈশ্বরকে পূজা করিতে, কখনো বলিয়াছেন দেশকে পূজা করিতে, কখনো বলিয়াছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে দিশাহারা হইতে, ছয় ঋতুর কোনটিকে বাদ দেন নাই। কখনো বলিয়াছেন প্রেম করিতে, কোনটি সঠিক রাস্তা? বাঙালী অবশ্য শেষ ব্যাপারটিতে প্রচুর উৎসাহ দেখাইয়াছে। যাহা হউক, খোলসা করিয়া কিছু বলিবেন কি?'

রবীন্দ্রনাথ বেগ দ্রুততর করিলেন।

'এত ডিফারেন্ট লাইনে কথাবার্তা বলিলে লোকে কনফিউজড হইবে না? আপনার বিভিন্ন মুডে আপনি বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলিলে জনতা সঠিক লাইনটি ধরিবে কি করিয়া? তাহার মধ্যে আবার জুড়িয়া দিয়াছেন সুর। ফলে যোগ হইয়াছে হারমোনিয়ামের চাবি টিপিবার কসরৎ। যে কোন রবিবার সকালে যে কোন পল্লীতে অন্তত: পঞ্চাশটি বাড়ি হইতে 'সা-রে-গা-মা' ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে - প্রত্যেকটি বিভিন্ন সুরে। কথা ও সুরের এই উরণনাভজালে বাঙালী এমনই জড়াইয়াছে যে বাহির হইবার রাস্তা নাই। আপনি এত জোরে হাঁটিতেছেন কেন? দৌড়াইতে আমার অসুবিধা হইতেছে। আমরা কোথায় আসিলাম? ইহা তো মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্র বোধ হইতেছে।

গুরুদেব নীরবতা ভঙ্গ করিলেন ।

‘গোবর, দেখ তো এই শুঁটকে ছোকরাটি কি বলিতেছে?’

ক্যাবলা দেখিল সন্মুখে দণ্ডায়মান একটি পর্বতপ্রমাণ শরীর, তাহার উপরে একটি ভয়ানক মস্তক। গোবরবাবু সবে পাঁচশত ডন সমাপ্ত করিয়াছেন - এবার মুগুর ভাঁজিবার পালা। মুগুবের সন্ধানে হাত বাড়াইলেন। ক্যাবলার কণ্ঠনালী শুকাইয়া গেল।

দুই অঙ্গুলির সাহায্যে গোবরবাবু ক্যাবলার গ্রীবাদেশ ধরিলেন এবং শূন্যে তুলিলেন। প্রশ্ন করিলেন, ‘তুই কে রে ?’

- স্যার, আমি ... মানে ... কমিশন ... মানে ... বাঙালী ... মানে প্রশ্ন ... ছাড়িয়া দিন প্লীজ ।‘
- ‘বটে, ছাড়িয়া দিলে কি করিবি ? আবার প্রশ্ন ?’
- ‘কি যে বলিতেছেন? প্রশ্ন উত্তর করিয়া কোন লাভ আছে কি? তাও যত সব অবান্তর প্রশ্ন।‘
- ‘আর কমিশনের কি হইবে?’
- অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিব । আমার হাতে আরও পাঁচটি কমিশন রহিয়াছে - জলদাপাড়ার জল- সমস্যা, নৈহাটির হাট- সমস্যা, সৌরভ গাঙ্গুলীর গৌরব সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি, উহাতেই ব্যস্ত থাকিব।’
- ‘আবার স্বর্গে আসিবি?’
- ‘পাগল?’

* * * * *

মরণের ওপারে

শ্রীমতী শুক্লা দে

জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের মূল বিষয়বস্তু রূপে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মের মতে আত্মা অবিনশ্বর। প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রাণস্বরূপ যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মাই অংশ বা অন্য একটি রূপ। অনন্ত কালের স্রোতে আবর্তিত হতে হতে এই পরমাত্মাই জীবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন এবং কিছু সময়ের জন্য এই মায়ার সংসারে কাল অতিবাহিত করেন। প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই এই নির্দিষ্ট সময়টুকু ভিন্ন ভিন্ন। কাল অতিক্রান্ত হলেই জীবাত্মা জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহ পরিত্যাগ করেন। আবার নতুন দেহ ধারণ করে, নতুন নতুন রূপে পৃথিবীতে জন্ম নেন নতুন কোন মাতৃগর্ভে। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে জীব জন্মের পর জন্ম লাভ করে এই মায়ার সংসারে। প্রারব্ধ ফল কাটতে কাটতে কোন এক জন্মের শেষে জীবাত্মা মিলিত হয় পরমাত্মার সঙ্গে অমৃতলোকে। আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই এই পৃথিবীতে যা ধ্রুব সত্য তা হল মৃত্যু। কবির ভাষায় বলতে গেলে, ''জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।'' মানুষের জীবন অমর হয় না, তার সৎকর্ম তাকে অমর করে রাখে অন্য মানষের মনে। এই জীবন মৃত্যুর খেলা চলে কালচক্রের নিয়ম অনুসারে। শুধু মানুষই নয়, সমগ্র জীবজগৎ বাঁধা রয়েছে একই চক্রজালে।

কর্মফল অনুযায়ী নতুন জন্ম, নতুন পিতামাতা, নতুন পরিবেশ নির্ধারিত হয়।স্বর্গ বা নরক বলে কিছু নেই। মানুষ এক জীবনেই স্বর্গলাভ বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। আমরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র একবার পরিত্যাগ করলে আর গ্রহণ করি না, তেমনি পূর্ব জন্মের সবকিছুকেই বিস্মৃত হই নতুন জন্মে। তবে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে অপূর্ণ কোন প্রবল ইচ্ছা বা গভীর মানসিক স্থিতি বা আজন্ম পালিত সংস্কার বা বিশ্বাস যা তার আত্মাকে স্পর্শ করে, তার কিছু কিছু পরবর্তী জীবনেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একটি শিশু যখন বিনা কারণে ঘুমের মধ্যে কখনো হেসে ওঠে বা কেঁদে ওঠে, ডাক্তারী শাস্ত্র অনুযায়ী তা কেবল নতুন একটি দেহে মাংসপেশী সঞ্চালন মাত্র। কিন্তু যাঁরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে শিশুর এই হাসি বা কান্না পূর্ব জন্মের স্মৃতি বিজড়িত। নতুন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পর এই স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়। তাই আর পূর্ব জন্মের কোন ঘটনাই প্রকাশ পায় না। দুই বৎসর বয়সকালের মধ্যে সে সম্পূর্ণভাবে সবকিছু বিস্মৃত হয়। তবে ব্যাতিক্রমী কিছু মানুষও জন্ম নেয় যারা জাতিস্মর নামে চিহ্নিত। সাত আট বছর বয়স পর্য্যন্ত তারা পূর্ব জীবনের অনেক কথাই মনে রাখতে পারে। যার বেশীর ভাগ কথাই শিশুর অবাস্তব কল্পনা বলে গ্রহণ করা হয় না। কখনো কখনো মস্তিষ্ক বিকৃতি অনুমান করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুর নবজন্মের আপন জনেরা সন্তান হারানোর ভয়ে তার কোন কথাই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন না। নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে তাকে বাধ্য করা হয়। তবে এমন কিছু জাতিস্মর মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম নেয় যাদের দেখে সমাজের বাকি মানুষেরা বিস্ময়ে অবাক হতবাক হয়ে যায়। এই সব মানুষদের দেখে বেদে বর্ণিত জন্মান্তরের কথা হাজার হাজার বছর পরেও বর্তমান যুগে অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ থাকে না। এই ঘটনা যে শুধু আমাদের দেশেই ঘটে তা কিন্তু নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে এমন অজস্র সত্য ঘটনার সাক্ষী আছেন বহু মানুষ। জন্মান্তরবাদকে তাঁরা অস্বীকার করলেও, বিজ্ঞান কিন্তু আজও এর পিছনের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে নি। জাপানে বর্তমান প্রজন্মের এমন অনেক শিশু আছে যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সমকালীন অনেক ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিতে পারে এমন ভাবে যেন তারা ঐ সব ঘটনা চাক্ষুষ ঘটতে দেখেছে। তিব্বতীরা আজও বিশ্বাস করেন দলাই লামার মৃত্যুর আগেই তাঁর নতুন জন্ম কোথায়, কিভাবে, কার মাধ্যমে সংঘটিত হবে, তা পূর্ব নির্ধারিত।

প্রাক্তন সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আইয়ার তার রচিত 'ডেথ অ্যান্ড আফটার' বইটিতে দেশ বিদেশের এমন অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এমনকি মৃত্যুর কাছাকাছি আসা বেশ কিছু অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণিত আছে বইটিতে। ঘটনার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তিনি অনেক তথ্যের অবতারণা করেছেন বইটিতে। অড্রে রোজ নামে একজন বিখ্যাত বিদেশিনী লেখিকা তাঁর লেখা বইতে এমন এক জাতিস্মরের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন যা পাঠক কুলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলো। ভয়ংকর এক গাড়ী দুর্ঘটনায় একটি শিশুর মৃত্যু হবার কয়েক বছর পরেই সে আবার একই পরিবারে জন্ম নেয়। জন্মকালেই তার শরীরের নানা অংশে আগুনে পোড়া চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, শিশুটি যখন প্রথম কথা বলতে শুরু করে তখন হঠাৎ একদিন সে গাড়ী দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করে। কোথায়, কিভাবে, কখন

দুর্ঘটনা ঘটে ছিল, গাড়ীতে কে কোথায় বসেছিলো, এমন কি গাড়ীটির বিশদ বর্ণনাও সে দিয়েছিলো। একই পরিবারে জন্ম হলেও তার পিতামাতা ছিল ভিন্ন। কিন্তু সে তার পূর্বজন্মের পিতামাতাকে চিনতে পারে। সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় তার বাবা- মা আইনের সাহায্য নেন এবং বহু দিন কেস চলার পর শিশুটির ইচ্ছাতেই সে তার পূর্বতন পিতামাতার কাছে ফিরে যায় দত্তক সন্তান হিসেবে।

ষাটের দশকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সত্য ঘটনা সমগ্র কেরালাবাসীর মন তোলপাড় করে তুলেছিলো। একজন ব্রিগেডিয়র তাঁর জন্মস্থান কেরলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে কোন উৎসব উপলক্ষে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামেরই এক চার বছরের শিশু তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর নাম ধরে ডাকতে থাকে এবং প্রথা অনুযায়ী তাঁকে সেল্যুট করে সম্মান জানায়। তার এই আচরণে শুধুমাত্র ব্রিগডিয়রই নন, উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় এরপর সে জানায় সে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের একজন সেনা ছিল এবং এই সেনাধ্যক্ষের অধীনে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। ব্রিগেডিয়রের কাছে সে অন্যান্য সহযোদ্ধা যারা ছিলো তাদের প্রত্যেকের নাম বলে তাদের সংবাদ জানতে চায়। এমন একটি ঘটনা সকলকে হতবাক করে দিলেও সেই বালকটিকে কিন্তু বিরত করা যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই সে ভারত- পাক যুদ্ধ নিয়ে নানা কৌশলগত পরিণতি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে।

তামিলনাড়ুর চেন্নাই শহরের 'ম্যান্ডোলিন শ্রীনিবাস' আজ প্রথিতযশা ম্যান্ডোলিন বাদক হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু তিনি যখন তিন চার বছরের নিতান্ত শিশু ছিলেন তখনও তিনি ম্যান্ডোলিন বাদনে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে, যে কোন কঠিন রাগ রাগিনীতে ম্যান্ডোলিন বাজানো তাঁর কাছে সহজসাধ্য ছিলো। বহু বছরের সাধনার পরেও যে শিক্ষা করায়ত্ব করা অনেকের কাছেই অত্যন্ত দুরূহ, সেই ক্ষমতা একটি তিন বছরের শিশুর মধ্যে দেখে মানুষজন তাকে এক সাধারণ বালক হিসেবে মানতে পারে না। রাগ রাগিনীতে এমন দক্ষতা অনেক বড় বড় ওস্তাদের কাছে ছিল বিস্ময়কর এবং তাঁরা তাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে গ্রহণ করে নেয়।

উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামে একজন চাষীর শিশু কন্যা নিজেকে কল্পনা চাওলা হিসেবে দাবী করে। মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীর বাইরে ঘুরে বেড়ানোর গল্প সে যখন সকলকে বলতে থাকে তখন অক্ষরজ্ঞানহীন তার বাবা মা এবং গ্রামের অন্যান্যরা তার কথা বুঝতে না পেরে পাগলের প্রলাপ বলে ভাবতে শুরু করে। সে বোঝাতে চায় বহু দূরের এক দেশ আমেরিকায় সে থাকতো। তার বাবার নামও সে জানায় যিনি বর্তমানে হরিয়ানায় বাস করেন। পরে অবশ্য তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

লক্ষনৌ শহরের আরো এক শিশু সুষমা দুই বছর বয়স থেকেই 'রামচরিত মানস' নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতো। অশিক্ষিত পরিবারে জন্ম হলেও সে অনর্গল ইংরাজী এবং শুদ্ধ হিন্দী ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে পারতো। মাত্র সাত বছর বয়সে সে বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করলে সরকার তাকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। সে অঙ্কে, পদার্থ, রসায়ন এবং জীবনবিজ্ঞানেও সমান পারদর্শী ছিলো। তার এই মেধা জন্মান্তরের আরব্ধ ছাড়া আর কি হতে পারে!

শাহারানপুরে এক দলিত পরিবারের বালক রাজেশ হঠাৎই মাতৃভাষা হিন্দী ভুলে গিয়ে আমেরিকান ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করে। তার এমন পরিবর্তনে সকলে ভয় পেয়ে তাকে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন সে এক বিশেষ বালক। তাঁর চেষ্টাতেই তাকে এক মিশনারী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এক পাদ্রী সাহেবের অভিভাবকত্বে রাখা হয়। কারণ তার নিজের লোকজন তাকে আর বাড়ী ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা হয় সে কোন অপদেবতার কবলে পড়েছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে সে ইংরাজীতে দুটি বই লেখে যার বিষয় বস্তু ছিলো বিশ্বাস ও তার পরিণতি।

শৈশব থেকেই পন্ডিচেরীর পাকিয়াশ্রীর মনে ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। খেলার সাথীদের ছেড়ে সে মেডিক্যাল জার্নাল নিয়ে পড়াশুনো করতে পছন্দ করতো। মাত্র ৮ বছর বয়সে কমপক্ষে ১০০০ টি রোগের প্রতিকার ও কার্যকরী ওষুধপত্র নিয়ে আলোচনা করতো বড় বড় নামী দামী ডাক্তারদের সঙ্গে। আহমেদাবাদের রাকেশ মাত্র তিন বছর বয়সে বাড়ী থেকে অনেক দূরে গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার মৃত্যু সংবাদ পাবার অনেক আগেই সে তার মায়ের কাছে

ফিরে আসে এবং তাঁকে কথা দেয় আবার সে ফিরে আসবে তার মায়ের কোলেই। ২০০৫ সালে তার মৃত্যু হয় আর একবছর পরে ২০০৬ সালে তার মা যে পুত্র সন্তান জন্ম দেন সে তার পূর্ব জীবনের সকল ঘটনা সবিস্তারে সকলকে জানিয়েছিলো এমনকি তার দুর্ঘটনার কথাও। দিল্লীবাসী এক গুজরাটী বালিকা তার মৃত্যুর চার বছর পরে তারই শ্রাদ্ধবাসরে ফিরে এসে সকলকে অনুরোধ জানায় তার ফটো থেকে মালাটা যেন খুলে ফেলা হয়। আলোয়ার নিবাসী এই মেয়েটি তার বর্তমান বাবা মার সঙ্গে দিল্লীতে আসে ঐ বিশেষ দিনে। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য রকমের মিল ছিলো এবং সে তার পূর্ব জীবনকে সকল আত্মীয়স্বজনকে নাম এবং সম্পর্ক অনুযায়ী চিনতে পারে। লন্ডনে ১০ বছরের ছেলে অর্পণ শর্মা মোট ১১ টি ভাষায় শুধু কথা বলতে পারা নয়, প্রতিটি ভাষায় সে যথেষ্ট পারদর্শী এবং জ্ঞানী ছিলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে কোন দিন এই সব ভাষা শেখেনি।

পৃথিবী জুড়ে এমন অনেক ঘটননাই ঘটে যার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 'নিমহ্যান্স' মানসিক হাসপাতালের সতয়ন্ত পস্‌রিচা 'স্টেট য়ুনিভারসিটি অফ ভার্জিনিয়া'র হয়ে ১০ খণ্ডের বই এর উপর কাজ করেছেন এমনই সব আশ্চর্যজনক মানুষের জীবন নিয়ে যাঁরা পূর্ব জীবনকে ভুলতে পারেননি বলে মানসিক রোগী হিসেবে চিকিৎসাধীন। 'ক্যালিফোর্নিয়া হীপনোসিস ইনস্টিটিউট' এবং মুম্বাই এর তৃপ্তি জৈন একটি সংস্থা চালান যার নাম 'পাস্ট লাইফ রিগ্রেশান থেরাপি' (PLRT)। ভারজিনিয়া স্টেট য়ুনিভারসিটির ওয়াল্টার সেমক্যু, যাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত বই 'বর্ন এগেন' এবং 'ওরিজিন অফ সোল'। তিনি বর্তমানে সারা পৃথিবীর বহু মানুষের পূর্ববর্তী জন্ম এবং নবজন্ম নিয়ে কাজ করছেন। সন্তোষ যোশীও এই একই কাজে যুক্ত আছেন। এঁরা সকলে বেশ কিছু নামী ভারতীয়দের নিয়ে কাজ করেছেন যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। এঁদের দেওয়া তথ্য যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ। এঁরা বলেছেন ভ্যান জোস হলেন মহাত্মা গান্ধীর নতুন জন্ম। টেন্নেসির এক গ্রামে তিনি জন্মান ১৯৬৮ সালে এবং আজও গান্ধীজীর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছেন। পেশায় তিনি একজন উকিল এবং সমাজসেবক। প্রতিটি গরীব মানুষের স্বাধিকার লাভ করা ও পুলিশ দিয়ে সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। এঁদের তথ্য অনযায়ী অভিনেতা চাংকী পাণ্ডের পূর্ব জন্মের স্ত্রী এবং কন্যা পুনর্জন্ম লাভ করে এই জীবনে তাঁর স্ত্রী ও কন্যারূপে জন্মেছেন। অভিনেতা এডউইন বুথ নতুন জীবনে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। বুথের দুই অভিনেত্রী স্ত্রী ছিলেন মেরী ডেলভিন এবং মেরী ভিক্রে। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয়া স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এঁরাই পুনর্জন্ম লাভ করেছেন জয়া ভাদুড়ী ও রেখা হয়ে। এঁরা বলেছেন বাহাদুর শাহ নেহেরু হয়ে এবং আব্দুল কালাম হলেন টিপুসুলতানের নবজন্ম। অভিনেতা শাহরুখ খান ছিলেন গতজন্মে বাঙালী অভিনেত্রী এবং নর্তকী সাধনা বোস।

বেদে বর্ণিত জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয় তবে কর্মফল অনুযায়ী জীবকুল পরবর্তী জন্ম লাভ করে। তবে একথা আজ কেউ বিশ্বাস করে না, বা তাদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না। তাই তো লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতার জোয়ারে মানুষ আজ ভেসে চলেছে অপকর্মের অতল অন্ধকারে। পরের জন্মে কেমন জীবন হবে তা নিয়ে কেউ আজ ভাবে না। তবে এই সব সংস্থা নামী মানুষদের জন্মান্তর নিয়ে যা বলেছেন সেইসব তথ্যের বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতখানি তার প্রমাণ আমাদের জানা নেই। তবে একটা প্রশ্ন মনের মাঝে বার বার ঘুরে ফিরে আসে। যেমন ধরা যাক্ শাহরুখ খানের কথা। শাহরুখ জন্মে পাঠান, ৭ বছর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব কেটেছে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে, এরপর বড় হওয়া পড়াশুনো দিল্লীতে, কর্মসূত্রে থাকেন মুম্বাইতে। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, সম্মান তিনি কিন্তু লাভ করেছেন, তাঁর অভিনয় ও নাচ দিয়ে। শুধু ভারতে নয়, জগৎ জোড়া তাঁর খ্যাতি। সেই বাদশা খান তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত সব রাজ্যকে বাদ দিয়ে কেন বাংলার ক্রিকেট দল 'নাইট রাইডার্স' কিনলেন কোটি কোটি টাকা টাকা খরচ করে? তাঁর এই দল দু'একবার ছাড়া, প্রতিবছরই তাঁকে লোকসানের ভরাডুবিতে ডুবিয়েছে। তা স্বত্বেও তিনি এই দলকে ত্যাগ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের মতন হতদরিদ্র রাজ্যের তিনি ব্র্যান্ড এই রাজ্য কি তাঁকে কোনভাবে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করতে পারবে? সব রাজ্য ছেড়ে তিনি কেন এলেন এখানে? তাঁর কেন এই বাঙালী প্রীতি? তবে কি সত্যিই তিনি ছিলেন গত জন্মের বাঙালী অভিনেত্রী সাধনা বোস? তাঁর বর্তমান জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে যুক্ত থাকলেও তাঁর আত্মিক টান কি তাঁকে নিয়ে এসেছে বাংলার মাটিতে? সাধনা বোস কি আবার নতুন রূপে ফিরে এলেন শাহরুখ খান হয়ে?

* * * * *

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৭শে নভেম্বর ১৮৮৮ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৭। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। ১৮৯৮ সালের ২২ শে এপ্রিল রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালের ২২ শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হলে রথীন্দ্রনাথ প্রথম পাঁচজন ছাত্রের অন্যতম ছিলেন। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ২৩ শে নভেম্বর ১৯০২ কলিকাতায় মৃত্যু হয়। ১৯০৬ সালের ৩রা এপ্রিল রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়বার জন্য আমেরিকা গমন করেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করে ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯১০ সালের ২৭ শে জানুয়ারি (১৪ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রথীন্দ্রনাথের বিবাহ প্রতিমাদেবীর সঙ্গে হয়। প্রতিমাদেবী ছিলেন পাঁচ নং ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর মাতুল। এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতে৷ ভাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। সুতরাং প্রতিমাদেবী সম্পর্কে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতনী। প্রতিমাদেবীর মা ও বাবার নাম যথাক্রমে বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। প্রতিমাদেবী ছিলেন বালবিধবা। ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হল।

সপরিবারে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৬
বাম দিক হইতে : কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী
সুকুমার রায় -গৃহীত ফোটোগ্রাফ । শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে

প্রতিমাদেবীর জন্ম হয় ৫ই নভেম্বর ১৮৯৩ সালে। তাঁর জন্মের পর কবিপত্নী মৃণালিনী তাঁকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ও অনুমোদন ছিল। কিন্তু প্রতিমাদেবীর অভিভাবকরা অপেক্ষা করতে রাজি না হওয়ায় এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথেরই বাল্যবন্ধু নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে ফাল্গুন ১৩১০ বঙ্গাব্দে। দুর্ভাগ্যবশতঃ নীলানাথের মৃত্যু হয় মাত্র কয়েকমাস পরে বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দে গঙ্গায় ডুবে। এই প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন - রথীকাকা বিলেত থেকে ফিরে এলে রবিদাদা বাবাকে বললেন "তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বল যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হল না। এ বয়সে চারিদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেইটাই কি তোমাদের কাম্য? না বিয়ে দেওয়া ভাল, সেটা বুঝে দেখ।"

তখন বড়পিসি বললেন "আমাকে যে সমাজ একঘরে ঠেলবে। আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। "বাবা বললেন, "তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের পিছনে আমি আছি। তোমায় সমাজ ত্যাগ করলে আমিও সমাজ ত্যাগ করব। তাই বলে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না। আর বাইরের ছেলে নয়, রবিকাকা রথীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। তুমি অমত কোর না। এখন প্রতিমার মত নেওয়া দরকার, তাকে বোঝাতে হবে।"

প্রথমে শুনে প্রতিমা রাজি হয় নি। বাবা অনেক বুঝিয়ে তবে রাজি করিয়েছিলেন। বললেন, "যা তোর হয়ে গেছে সেটা স্বপ্ন ভেবে নিস। এখন নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে। সমাজ কে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন । সমাজের বাধা অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরিতে (২২ জানুয়ারি ১৯১০) লিখেছেন "সমর (গগনেন্দ্র ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গগনদের সঙ্গে রথীর বিবাহ সম্বন্ধে কথা হল - ওরা এবার খুব সাহস দেখিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০) আমেরিকা প্রবাসী জামাতা নগেন্দ্রনাথ কে লেখেন 'বিবাহটি' বিধবা বিবাহ হয়েছে তাও বোধহয় শুনেছ। তা নিয়ে গোড়ায় একটা ঝড় ওঠার সম্ভাবনা হয়েছিল কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না করাতে সেটা কেটে গেল।

বিয়ের সময় প্রতিমাদেবীর বয়স ছিল ষোলো আর তাঁর স্বামীর বয়স একুশ। প্রতিমাদেবীরা থাকতেন পাঁচ নম্বর বাড়িতে আর তার পাশেই ছয় নম্বর বাড়িতে ছিল শ্বশুরবাড়ি। এই বিবাহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে শুধু বিধবা বিবাহই নয় প্রতিমাদেবীরা ছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। শাশুড়ি জীবিত না থাকায় বধূবরণের ভার নেন জ্যাঠাশাশুড়ী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এরপরে তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে বলেন - "তোমরা দুজনে যে নতুন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছ, তার গভীরতা বিস্তীর্ণতা যেন তোমরা অনুভব কর। গৃহ যেন কেবল তোমাদের আরামে বিরামে বিলাসিতায় আবদ্ধ না থাকে, যেন তার দ্বার সকলের মঙ্গলার্থে খোলা থাকে।"

কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর বউমাকে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের দেখাবার জন্য। মাঘ মাসের শেষ দিকে ট্রেনে করে তাঁরা রওনা দেন বোলপুরের উদ্দেশ্যে। দুপুর দুটোয় ট্রেন ছেড়ে বোলপুর পৌঁছায় প্রায় সন্ধ্যে সাতটায়। স্টেশন থেকে তাঁরা গরুর গাড়ি করে শান্তিনিকেতন যান। প্রতিমাদেবীর এই প্রথম গরুর গাড়ি চড়া। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যে উৎসবের আয়োজন করেছিল তাতে 'মালিনী' ও 'বিসর্জন' নাটকগুলি অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নাটকগুলির ট্রেনিং দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেন। প্রতিমাদেবী লিখেছেন - বাবামশায় তখন গীতাঞ্জলির গানে সুর বসাচ্ছেন। অনেক রাতে ছেলেরা শুতে গেছে বৈদিক গান গেয়ে। আশ্রম যেন ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই। শান্তিনিকেতনের বারান্দায় বসে বাবামশায় কত রাত পর্যন্ত সুরের পর সুর দিয়ে চলেছেন। সে গান ছাপিয়ে উঠতো নিস্তব্ধ ঘুমন্ত আশ্রমের আকাশ। অনেক সময় হঠাৎ পাশের ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে সেই গভীর রাতে কানে আসত -

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী'

কখনো বা শুনতে পেতুম - 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি'
এই গানগুলি শিখে নেবার জন্য সকালে ডাক পড়ত দিনু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর - রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি) অথবা অজিতবাবুর (অজিত চক্রবর্তী) যিনি তখন কাছাকাছি থাকতেন। বাবামশায় কখন যে শুতে যেতেন আমরা জানতেও পারতাম না। খুব ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই শান্তিনিকেতন মন্দিরে পূর্বদিকের চাতালে তাঁকে উপাসনায় বসে থাকতে দেখা যেত। সেই সময় গুরুদেব একটি গভীর সাধনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখনকার মনের ধারণা ও অনুভূতিই গীতাঞ্জলির গানের মধ্যে রূপ নিয়েছিল।

রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথও বহু গুণের অধিকারী ছিলেন কিন্তু সেগুলি তাঁর মহান প্রতিভাধর পিতার ছায়ায় থাকায় সাধারণ লোকের আগোচরে থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে জানতে পারি - তখন আমরা নতুন, আশ্রমের ছেলেমেয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ সালাপ বিশেষ হয়নি। উত্তরায়ণের সামনের ও পিছনের বাগানে বেড়াতুম সকালে বিকেলে। কি সুন্দর বাগান করেছিলেন রথীদাদামশায়। উদয়ণের পিছনে ছিল স্টেপ গার্ডেন, তার এক পাশে জাপানি ল্যান্ড স্টেপ গার্ডেন। জাপানি কায়দায় বাঁধানো ছোট্ট এক জলাশয়। জলাশয়ের মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ আর সেখানে পাড় থেকে জলের উপর দিয়ে যাবার জাপানি ল্যান্ডস্কেপের স্টেপ। এই জলাশয়কে ঘিরে চারপাশে নুড়ি বিছানো রাস্তার একধারে গুহাঘর, রথীদাদার কাজ করার স্টুডিও। তার দোতালায় প্রতিমাপিসির স্টুডিও। রথীদাদা তাঁর গুহাঘর স্টুডিওয় কাজের টেবিলের সামনে বসে কত ধরণের হাতের কাজ করতেন - বিশেষ করে কাঠ খোদাইয়ের কত যে অগুনতি কাঠের কাজ করেছেন তা বলে শেষ করতে পারব না। এছাড়া রথীদাদা ছিলেন এক প্রথম সারির উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। কর্তাবাবা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাঁকে আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র করে পাঠান। উত্তরায়ণের বাগান ও বাড়িগুলি প্রথমদিকে ছিল ধূসর রুক্ষ, ধূ ধূ করা প্রান্তের মধ্যে এক মরূদ্যান। উত্তরায়ণের বাগানে রথীদাদার আমলে নাম জানা বা না জানা দেশী বিদেশী গাছের যে সম্ভার ছিল তা দেখার মত। তিনি প্রকৃতির নিয়ম

লঙ্ঘন করে লোহার ফ্রেমের উপর আম, জাম, আতা, পেয়ারা, কুল, আমলকি বা লেবুর গাছ লাগিয়ে যে সব ছায়া ঢাকা পায়ে হাঁটার পারগোলার সৃষ্টি করেছিলেন, তা দেখার মত, যা তখন ভারতে আর কোথাও ছিল কিনা জানি না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : -
১। রবীন্দ্রজীবনী - প্রশান্ত পাল
২। ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা - সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। ঠাকুরবাড়ির কথা - হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়
৪। রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। পুরণো খাতা - প্রতিমাদেবী

* * * * *

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

উত্তম কুমার বণিক

মোবাইল্ ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে বন্ধ হয়ে গেল। অমিত কাজে ব্যস্ত ছিল বলে ধরতে পারল না ফোন কল্টা। এই দিয়ে ও চার বার ফোন কল মিস্ করল। আজ প্রায় মাস খানেক ধরে ওর এই ব্যস্ততা চলছে। নতুন প্রজেক্টটার ডেড্ লাইন খুব কাছে চলে এসেছে। কিন্তু ক্লায়েন্ট এখনও রিকয়ারমেন্ট চেঞ্জ করে যাচ্ছে। এডিশনাল রিসোর্সও নেই যে একটু রিলিফ পেতে পারে ও! ফোনটা আবার বেজে উঠল। ওর হঠাৎ মনে হল, তবে কি কেয়া ফোন করছে? লাষ্ট রিংটা শেষ হবার আগেই ও ফোনটা কলারের নাম নে দেখেই রিসিভ করল। ও যা ভেবেছিল, তাই সত্যি! কেয়াই ফোনটা করেছে। "তুমি যদি না আসতে পারবে সময়ে, একটা ফোন করে তো বলতে পার। এখন রাত বারোটা বাজতে যাচ্ছে, অথচ তোমার একটা ফোন করে জানাবার ফুরসৎ হলো না? দুনিয়াতে আর কেউ কি কাজ করে না" - কেয়া নিজের ফ্রাশটেশন ভেন্ট করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। অমিত নিজের ভুল বুঝতে পারল। বলল -"কেয়া, আই এম রিয়েলি ভেরি সরি! আর মিনিট পনের পরেই বেরুচ্ছি। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো না, খেয়ে নিও। এখন রাখছি।"

অমিত এই মাল্টি ন্যাশনাল আই টি কোম্পানীটাতে আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে কাজ করছে। এর আগে ও আর একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীতে বছর তিনেক চাকরী করেছিল। ওর প্রেজেন্ট কোম্পানী ওর কন্ট্রিবিউশনকে রেকগনাইজ করে ওকে প্রজেক্ট ম্যানেজার করেছিল এক বছর আগে। ও ছিল খুব ক্যারীয়ারিস্ট। নিজের হার্ড ওয়ার্ক আর ডেডিকেশন দিয়ে ও সমস্ত প্রজেক্টের কাজে সাফল্য পেত।

কেয়া ওর অপেক্ষায় বসে ছিল ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে। অমিতের বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত একটা হয়ে গেছিল। ও খুবই টায়ার্ড হয়ে পড়েছিল। কেয়ার দিকে তাকিয়ে ও কিছু বলার চেষ্টা করছিল। কেয়া নিজেকে শান্ত রেখে বলল - "অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন খেয়ে নাও। যা কথা বলার, কালকে সকালে বলো।" ওরা নীরবে খাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গেল।

অমিত পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। কেয়া ওকে বিগত রাতে টায়ার্ড দেখে জাগাতে চায়নি সকাল-সকাল। সপ্তাহের এই রবিবার দিনই ও কখনো-সখনো বাড়ীতে থাকার সুযোগ পেত ইদানিং। ওদের আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে, পিউ, খুব খুশী ওর বাপিকে বাড়ীতে পেয়ে। মা নিষেধ করেছে বলে ও বাপিকে জাগাতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনটা খুব উশখুস করছিল। বাপির মাথার বালিশের পাশে বসে ছিল। কিছুক্ষণ ধৈর্য রাখার পর, ও বাপির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ওর শীতল কোমল হাতের স্পর্শে অমিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎই। চোখ খুলতেই পিউকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল ওর মন। "মা-মণি" বলে আদর করে ওকে বুকে টেনে নিল। কৃত্রিম অভিমান করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল -"তুই আমাকে আরো আগে তুলে দিস নি কেন?" পিউ বাপির কথা শুনে বলে উঠল - "বারে, তুমি যে খুব ক্লান্ত ছিলে। মা, বলল যে!"

কেয়া ওদের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিল রান্না ঘরেতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা-বিস্কিট নিয়ে হাজির হল ওদের বেড্ রুমে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে বলল -"বারণ করা সত্বেও, বাপিকে তুলে দিলি তো?" মেয়ের দিকে দুধের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল -"এখনতো বাপি ঘুম থেকে উঠেছে! এবার তা'তাড়ি দুধটা খেয়ে নে।" চায়ের কাপটা অমিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে, খাটটার ধারে বসল কেয়া।

অমিতের বিগত রাতের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ও বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল এই ভেবে যে, কেয়া এত তা'তাড়ি সব কিছু ভুলে গেল কি করে! ও অফিসের কাজে এতই মগ্ন ছিল যে, ওর বাড়ীতে ফিরতে দেরী হবে জেনেও কেয়াকে জানাতে ভুলে গেছিল। ওর ইচ্ছে হল, কেয়াকে অফিসের কাজের চাপের কথা জানাতে। কেয়া ওর মনোভাব টের পেয়ে, ওকে বিরত করল। বলল -"একটা দিন ছুটি পেয়েছ অনেকদিন পরে। আজ আর অফিসের কথা নয়। আজ শুধু হৈ-চৈ, আনন্দ

করে কাটাব। কাছে-পিঠে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব। লাঞ্চ বাইরে করব।" পিউ মার কথা শুনে খুব খুশী হয়ে উঠল। আনন্দে উচ্চস্বরে বলতে থাকল –"কি মজা, আজ আমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাব।"

অমিতের খুব ভাল লাগছিল, মেয়েকে আনন্দ করতে দেখে। কখন যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তা বুঝতে পারল কেয়ার কথাতে। "চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে! ঘুম থেকে উঠেই আবার কি ভাবতে শুরু করলে। আবার বলে বস না যেন, এক্ষণি অফিসে যেতে হবে"- কেয়া কিছুটা নালিশের সুরেই যেন অমিতকে কথাটা শোনাল। অমিত, কেয়াকে আস্বস্ত করে বলল- "আজ আমি তোমাদের সাথে সারাটা দিন কাটাব। ব্রেকফাস্ট করেই বেড়িয়ে পড়ব। বোটানিকাল গার্ডেনে অনেক বছর যাই নি। চল, সকলে ওখানে ঘুরে আসি। কোন একটা ভাল রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে নেব।"

- ২ -

সে দিনটা ওদের সকলের খুব ভাল কেটেছিল, অনেক দিন পরে। প্রায় মাস ছয়েক তো হবেই। অমিত ওর সেই প্রজেক্টার ডেলিভারি করতে পেরেছিল ডেড্ লাইনের মধ্যেই। ক্লায়েন্ট এবং ওর বস্ খুব খুশী হয়ে ই-মেলে এপ্রিশিয়েশন জানিয়েছিল। পরের প্রজেক্টটা আসতে আরও দু-আড়াই সপ্তাহ কম করে লেগে যাবে। ওর শুধু চিন্তা, এই প্রজেক্টার জন্যে বেশ কয়েক মাস শুরুতে এবং শেষের দিকে ক্লায়েন্ট-সাইটে, মানে সিঙ্গাপুরে থাকতে হবে। কিন্তু পরিবার নিয়ে যেতে পারবে না, কন্টিনিউয়াসলি সিঙ্গাপুরে স্টে করতে হবে না বলে। বিগত প্রজেক্টার অভিজ্ঞতাটা কেয়ার বিশেষ ভাল হয় নি। বাড়ীতে থেকেও ও বাড়ীর জন্যে এতটুকু সময় দিতে পারে নি। কেয়াকেই বাড়ী সামলাতে হয়েছিল প্রায় মাস পাঁচেক! ও ভেবেই পাচ্ছিল না যে কি করে এই নতুন প্রজেক্টার কথা বলবে কেয়াকে।

অমিত দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ওর পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ঠিক করল। ওর বস্ পরের প্রজেক্টায় ওর ইনভল্ভমেন্টের কথা ভেবেই ছুটিটা এপ্রুভ করে দিলেন। অন লাইনে যাতায়াতের টিকিট, হোটেল রিসারভেশন, ইত্যাদি কম্প্লিট করে অফিস থাকে তা'তাড়ি বাড়ী ফিরল ও। কেয়া ওকে বিকেল বেলাতেই ফিরতে দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল –"শরীর ঠিক আছে তো?" পিউ ওর বাপিকে দেখে আনন্দে বলে উঠল – "কি মজা, বাপি এসেছে।" অমিত মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর করে কেয়ার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে বলল –"একদম ঠিক আছি। তোমাদেরকে একটা সারপ্রাইজ দেবার আছে।" কেয়া কৃত্রিম রাগ করে বলল – "তোমার আবার নতুন করে সারপ্রাইজ দেবার কি আছে! আরও একটা নতুন প্রজেক্টের কথা নিশ্চয়ই জানাবে! এবার হয়ত পুরো একবছর ধরেই প্রতিদিন লেট করে বাড়ী ফিরবে!" অমিতের থেকে ওদের বেড়াতে যাবার প্ল্যানটা জেনে কেয়া একটু আস্বস্ত হল। কিন্তু আজকাল ওকে অমিতের এই কাজের ধারায় কেন যেন একটু আশংকিত করে রাখত। মেয়ে বড় হচ্ছে। ওকে মাস ছয়েক বাদেই স্কুলে পাঠাতে হবে। এতদিক ও সামলাবে কি করে একা!

অমিত ঠিক করেছিল, কোলকাতা যাবার পথে ব্রেক জার্নি করে ওরা দিন পাঁচেক পুরী এবং ওর আশে-পাশের জায়গা গুলো ঘুরে দেখবে। তারপর বাকি সময়টা কোলকাতায় কাটিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ফিরবে। প্রায় বছর দেড়েক বাদে অমিত দিন পনেরোর ছুটি পাওয়াতে কেয়া এবং ওদের আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে, পিউ খুব খুশী। অমিত ও কেয়া, ওরা দুজনেই ওদের বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় অমিতদের বাড়ী টালিগঞ্জে। কেয়াদের বাড়ী দমদমে। ওদের প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। কলেজে পড়ার সময় থেকে ওরা পরস্পরকে জানে। অমিত যখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ে, তখন কেয়া সবে বি এ ইংলিশ অনার্স নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়া শুরু করেছে। ইউনিভারসিটির এনুয়্যাল ফেস্টিভালে ওদের প্রথম আলাপ হয়। সেই থেকে ভাললাগা আর তার পরে এই ভালবাসার সুত্রে আবদ্ধ হওয়া। ওদের মা-বাবার আপত্তি হয় নি দুজনের স্বভাব-চরিত্র-পরিবার দেখে। ওদের বিয়ে হয় চার বছর আগে।

- ৩ -

পুরীর সমুদ্রতটে বিকেল বেলায় ওরা বসেছিল। পিউ বালির উপর ছোটাছুটি করছিল। সমুদ্রের ঢেউএর সাথে বয়ে আনা ফুরফুরে শীতল বাতাসটা খুব ভাল লাগছিল। মেয়েকে সোয়েটার পড়িয়ে রেখেছিল, ঠান্ডা যাতে না লেগে যায় হঠাৎ।

অমিতের শীতকালটা খুব ভাল লাগে। কেয়ারও মন্দ লাগে না। যদিও ও একটু শীত কাতুরে। তবে গরম কাল একদমই পছন্দ নয়। কেয়ার ফেবারিট সিজন হচ্ছে বর্ষাকাল। ঘটনাক্রমে অমিতের এই ছুটি পাওয়াটা ডিসেম্বারের শেষ সপ্তাহে হওয়াতে, কোলকাতায় ওদের সকলের বেশ ভালই কাটবে।

অমিত ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর প্রথম দু বছর কোলকাতায় চাকরী করতে পেরেছিল। তারপরে সেই যে ডেপুটেশনে ব্যাঙ্গালোরে এল, আর কোলকাতায় ফিরে যেতে পারে নি এখনো পর্যন্ত। ব্যাঙ্গালোরে আছে প্রায় ছয় বছর ধরে। এখানকার ওয়ার্ক কালচার ওর খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরে প্রথম বার ডেপুটেশনে আসার সময়, ওর একটু দ্বিধা ছিল মনে। ব্যাঙ্গালোরে এসে ও হারিয়ে ফেলবে না তো, ওর কেয়াকে! তখনও ওদের বিয়ে হয় নি। না সেরকম কিছু হয় নি, ওদের ভালবাসার গভীরতা আর বিশ্বাস তা' হতে দেয় নি। সমুদ্রতটে বসে এলোমেলো চিন্তার সাথে হঠাৎই সেই দিনগুলোর কথা ওর মনে পড়ে গেল।

অমিতের মনে একটা দ্বন্দ ওকে খুব অন্যমনস্ক করে রেখে ছিল। ওর নেক্সট প্রজেক্টার প্রাথমিক তথ্যগুলো কেয়াকে জানাবার সাহস করে উঠতে পারে নি এখনও পর্যন্ত। বিগত প্রজেক্টার প্রায় পুরো ইমপ্লিমেনটেশন ফেজ্‌টাতে ও একদমই ওর পরিবারকে সময় দিয়ে উঠতে পারে নি। নতুন প্রজেক্টায় ওর ইনভল্ভমেনটের কথা শুনে কেয়া নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে পড়বে! ও প্রথমে ঠিক করেছিল, ছুটি কাটিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে গিয়ে ওর ওভারসিস্ এসাইনমেন্টের কথাটা বলবে কেয়াকে। কিন্তু সেটা হয়ত ঠিক হবে না। কেয়া ওকে ভুল বুঝতে পারে। বরং কেয়াকে ওর এখনই কনফিডেন্সে নেওয়া ঠিক হবে।

কেয়া অমিতকে অন্যমনস্ক দেখে একটু অবাক হয়ে পড়ল। বলল – "বেড়াতে এসেও এত কি কাজের চিন্তা করে যাচ্ছ?" অমিত মাথা নেড়ে নির্বাক হয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করল যে ও সেরকম কিছু ভাবছে না। কেয়া বেশ বুঝতে পারল যে, অমিত কিছু একটা বিষয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছে। তাই ওদের সাথে থেকেও যেন একাকী হয়ে রয়েছে। ওকি ওদের নতুন ফ্লাটটার কথা ভাবছে। সবে একবছর হয়েছে, একটা থ্রী বি এইচ কে ফ্ল্যাট বুক করেছে। এখনও কম করে আরও আট-নয় মাস লাগবে ফ্ল্যাটটার হ্যান্ডওভার পেতে। হাউজ্ লোন্ এমাউন্টাও অনেক। ১৫ বছরে লোন্‌টা ক্লীয়ার করার প্ল্যান করেছে ব্যাঙ্কের সাথে। কেয়া বেশ বুঝতে পারত, ও কেন এত হার্ড ওয়ার্ক করে অফিসে। ক্যারীয়ার তা'তাড়ি গ্রো না করলে, এই সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল কমিট্‌মেন্ট্‌গুলো কি করে সামলাবে?

নীল আকাশটা পড়ন্ত সূর্যের আভাতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চতুর্দিকে ছড়ানো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গায়ে কে যেন সোনালী, লাল, হলুদ রঙ অনেক নিপুণতার সাথে তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে! অমিত ও কেয়া বেশ মুগ্ধ হয়ে গেছিল এই দৃশ্যটা দেখে। কেয়া এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল যে, ও জানতে চাইছিল অমিত ওদের সাথে থেকেও কেন একাকী হয়ে রয়েছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসল ধীরে ধীরে। অদূরে রাস্তার উপর ল্যাম্পপোষ্টের আলোতে সমুদ্রতটে আলো-আঁধারী তৈরী হয়েছিল। সমুদ্রের ঢেউএর চূড়াগুলো হালকা আলোর প্রতিফলনে চিক চিক করতে লাগল। কেয়া পিউকে ডেকে নিল কাছে। তারপর অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল – "তুমি কি হাউজ্ লোন্ নিয়ে ভাবছিলে? ব্যাঙ্ক তো ১৫ বছরের টার্ম এক্‌সেপট্ করেছে! তা'হলে এত ভাবছ কেন?" অমিত, কেয়ার কথা শুনে না হেসে পারল না। বলল – "না রে বাবা, না, ওরকম কিছুই ভাবছি না।" একটু থেমে মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে বলল – "পিউ, সমুদ্র দেখতে কেমন লাগছে? জলের ফেনাগুলো কেমন তোর দিকে ছুটে আসছিল! আর তুই ভয়ে পিছিয়ে আসছিলি!" পিউ ওর বাপির মুখটা হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল – "হ্যাঁ, বাপি, সমুদ্র খুব সুন্দর। এত নীল জল! আর কি মস্ত বড়! সমুদ্র এত গর্জন করে কেন, বাপি? এত ফেনা হয় কি করে?"

কেয়া, পিউ আর ওর বাপির কথোপকথন থামাতে চাইল না। এই ভেবে, অন্তত অমিত তো চুপ করে নিজের মধ্যে নেই। অমিত এমনিতেই একটু কম কথা বলে। ওদের কথোপকথনের সাথে মাঝে মাঝে কেয়াও কথা বলছিল। কেয়া ঠিক

করেছিল, অন্য কোন সময় অমিতের ওই উদ্বেগের কথা জেনে নেবে। এরকম একটা সুন্দর মুহূর্ত ও অন্য কোন ভাবে নষ্ট করতে চাইছিল না। নিজের অজান্তে যেন প্রার্থনা করছিল, এরকম আনন্দের সাথেই যেন সারাটা জীবন কাটে ওদের। আরো কিছুক্ষণ একসাথে বসে গল্প করার পর ওরা সকলে সমুদ্রতটে একটু পায়াচারী করতে লাগল হোটেলে ফেরার আগে।

- ৪ -

পরের দিন বেশ ভোর বেলাতেই অমিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা হালকা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ও হোটেলটার তিন তলার ব্যালকনিটাতে রাখা চেয়ারটাতে বসে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউগুলোর পারে আছড়ে পড়া দেখতে লাগল। তখনও

আকাশ পরিস্কার হয় নি। সূর্যের আলো ফুটতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সমুদ্রের গর্জন শুনতে ওর বেশ ভাল লাগে। তার থেকেও ওর বেশী ভাল লাগে সমুদ্রের অগুনতি ঢেউগুলোর বিরামহীন ভাবে পারে আছড়ে পড়া! শীতল বাতাস চারিদিক খুব স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। মনের ভিতরে ও একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভব করতে পারছিল। অফিসের কাজের কথা একবারের জন্যও মনে পড়ছিল না।

সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখতে দেখতে অমিতের চোখে একটু তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। কেয়া যে কখন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ও টেরই পেল না। ওর কাঁধে হাত দুটো রাখার পর, অমিত বুঝতে পারল যে কেয়া এসেছে। ওর হাতটা টেনে নিয়ে, অমিত ওকে পাশের চেয়ারটাতে বসতে বলল। কেয়া কৃত্রিম নালিশের সুরে বলল – "আমাকে জাগিয়ে দাও নি কেন? একা একা সমুদ্র দেখতে খুব ভাল লাগে বুঝি?" কথাটা বলেই কেয়া ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। একটু থেমে ও আবার বলতে লাগল – "এই, তোমার মনে পড়ে, আমরা বিয়ের পরেই হানিমুন করতে পুরিতে এসেছিলাম। পাশের ওই সাগরিকা হোটেলটায় ছিলাম। মনে পড়ে তোমার, সমুদ্রের ঢেউ হঠাৎই আমাকে টেনে নিয়ে গেছিল, বালুচর থেকে অনেকটা দূরে। আর তুমি আমাকে সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে!" অমিত মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল। বলল – "হ্যাঁ, সেদিনটা খুবই ভায়ানক ছিল। ওরকম দিন যেন আর কখনই না আসে আমাদের জীবনে।"

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর, কেয়া নিস্তবদ্ধতা ভঙ্গ করে বলল – "কিন্তু, আমাদের ভুবনেশ্বর আর চিল্কা ট্রিপটা খুব ভাল হয়েছিল। তাই না?" অমিত মাথা নেড়ে সায় দিল। কেয়া সমুদ্রের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল – "এই, দেখছ, ওই জেলে গুলো কেমন ডিঙ্গি নৌকাটাকে ঢেউ ঠেলে সমুদ্রের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক গুলো নৌকা আরও আগে রওয়ানা দিয়ে থাকবে। তাই বেশ অস্পষ্ট দেখাচ্ছে!"

ধীরে ধীরে আলো ফুটছিল। আকাশের নীলাভ সুস্পষ্ট হতে লাগল। ঘরের কলিং বেলটা বাজতেই, অমিত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বেড্ টি আর বিস্কিটের ট্রে-টা ঘরের টি টেবিলটার উপর রেখে দিয়ে রুম সার্ভিসের লোকটা চলে গেল। দড়জাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে চায়ের ট্রে-টা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসল অমিত। কেয়া টি-পট থেকে চা কাপে ঢেলে অমিতের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং নিজের চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল। ঘরের বাইরে স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় বসে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ওদের বেশ ভাল লাগছিল। ওদের প্রথম পুরীতে বেড়ানোর কত সুখ-স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল। অমিত বেশ রোমান্টিক হয়ে পড়ছিল। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কলি ওর মনে পড়ে গেল। একটু গুন গুন করতে লাগল - "ভালবাসি, ভালবাসি, এই সুরে, কাছে দূরে, জলে-স্থলে বাজায়, বাজায় বাঁশী, ভালবাসি. . . "। কেয়া আজ অনেক দিন পরে যেন অমিতকে খুব রিল্যাক্সড দেখতে পেল। ইদানিং ওর অফিসের কাজের চাপে, টেনশন ছাড়া আর কিছু ওর চোখে-মুখে দেখতে পেত না।

- ৫ -

ওদের পুরীর ট্রিপটা খুব ভাল হয়েছিল। কোলকাতার বাড়ীতে নিজেদের বাবা-মায়ের সঙ্গে এবার প্রায় বছর দেড়েক বাদে থাকতে পারল কিছুদিন করে। অমিত ও কেয়ার বাবার এখনও বছর খানেক বাকি রিটায়ার করতে। কেয়ার বাবা ভি আর এস-এ এপ্লাই করেছিলেন যাতে দু বছর আগেই রিটায়ার হতে পারেন। কাজে আটকা থাকাতে দু'টো পরিবারই ব্যাঙ্গালোরে ওদের কাছে গেলে খুব বেশী হলে সপ্তাহ দুই থাকতে পারতেন। ওঁরা পালা করে যেতেন সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে। পাঁচ-ছয় মাস বাদে-বাদে। এতে ওদের সকলেরই মন খুব ভাল থাকত।

এত তা'তাড়ি অমিতের ছুটিটা শেষ হয়ে যাবে, ও যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, আরও কয়েকটা দিন সকলকে নিয়ে মা-বাবার সাথে থাকতে পারলে খুব ভাল হত। পিউ তো ওর ঠাম্মা-দিদা-দাদুদের ছেড়ে ট্রেনে উঠতে চাইছিল না। খুব কান্না-কাটি শুরু করে দিয়েছিল। কেয়ারও মনটা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল। ঠাম্মা-দিদার মনও খুব স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিল। ওঁরা সকলেই এসেছিলেন হাওরা স্টেশনে ওদেরকে সি-অফ্ করতে।

সন্ধ্যে-রাত্রে ট্রেনটা ছেড়ে ছিল। মনটা বিষণ্ণ ছিল বলে সে রাত্রে আর ওদের মধ্যে আর বিশেষ কোন কথা-বার্তা হল না। ওরা দুজনেই মখোমুখি লোয়ার বার্থ পেয়েছিল। পিউকে নিয়ে কেয়া শুয়েছিল। ভোর রাত্রে অমিতের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কাচের জানালার বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারল যে চিল্কা লেক পার হয়ে যাচ্ছে! আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটছিল। এ সি কামরা বলে বেশ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। মাত্র কয়েকদিন আগে ওরা এই চিল্কা লেকে বেড়াতে এসেছিল। অনেক সুখ-স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

কেয়ার কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অমিতকে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল - "একা একা বসে রয়েছ, আমাকে জাগালেই পারতে?" অমিত ওর কথা শুনে হেসে বলল -"তোমার সুখ-নীদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে করল না যে।" কেয়া, পিউকে কম্বলটা ঠিক করে গায়ে দিয়ে শুইয়ে দিল। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, অমিতের পাশে এসে বসল কেয়া। ওদের কামরার সকলে তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কেয়া জিজ্ঞেসা করল - "এর পরে কোন স্টেশন আসবে?" অমিত একটু ভেবে উত্তর দিল -"সম্ভবতঃ, পলাসা আসবে, সারে সাতটা নাগাদ। মনে হচ্ছে, ট্রেনটা সময় অনুযায়ী চলছে।"

এবার কোলকাতায় ওদের ক'টা দিন খুব হৈ চৈ আর আনন্দের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে থাকা ছাড়াও আরও কত জায়গায় ওরা ঘুরতে পেরেছিল। পিউতো চিড়িয়াখানা, নিকোপার্ক, প্লানেটরিয়াম ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে ভিষণ মজা পেয়েছিল। সময়টা এত তা'তাড়ি কেটে যাবে তা' ওরা বিশ্বাস করতে চাইছিল না। এরকম আনন্দ, হৈ-চৈ এর মধ্যে থেকে অমিত আর ওর নেক্সট প্রজেক্টার কথা এখনো বলে উঠতে পারে নি। এ জন্য ও মাঝে মাঝেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। কেয়া জানালার বাইরে অদূরে গ্রামের এদিক-সেদিকে ছড়িয়ে থাকা বাড়ীগুলো দেখে বিভোর হয়ে গেছিল। অমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল -"আচ্ছা, এই গ্রামের লোকগুলোও কেমন সুখে থাকার চেষ্টা করে, এত অভাব-দারিদ্র থাকা সত্বেও। দেখ, ওই লোকগুলোর গায়ে কোন গরম পোশাক নেই। কেমন দাঁতন হাতে নিয়ে ওই জলাধারটার দিকে খালি পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে!"

অমিত শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ও মনে মনে স্থির করেছিল যে, ব্যাঙ্গালোরে বাড়ীতে ফেরার আগেই ওর নেক্সট প্রজেক্টার কথা বলবে। মনটা খুব উশখুস করছিল। কেয়া আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল। কিন্তু অমিতকে অন্যমনস্ক দেখে ও একটু আশ্চর্য হচ্ছিল। তবে কি ও ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে এত নীরব হয়ে রয়েছে! কেয়া জানতে চাইল ওর নীরবতার কারণ। অমিত ভেবে পাচ্ছিল না, কি করে ওর নেক্সট প্রজেক্টার কথাটা বলবে। শেষ পর্যন্ত ও যখন সব কিছু পরিস্কার করে বলল, কেয়া একেবারেই হতবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে কেয়া নালিশের সুরে বলল -"এই কথাটা বলতে তোমায় এত সময় নিতে হল! তুমি তো ব্যাঙ্গালোর থেকে রওনা দেবার আগেই বলতে পারতে!"

অমিত নিশ্চুপ হয়ে রইল। ওর কি বা বলার আছে। ওদের কাজের ধারাই তো এরকম। যে এই কাজের ধারার সাথে তাল

মিলিয়ে চলতে না পারবে, সে যে প্রফেসনাল লাইফে একদমই পিছিয়ে পড়বে। ও জানে যে, কেয়া এ সব কিছুই বেশ ভাল মত বুঝতে পারে। আজ ওর ক্যারীয়ারের এতটা আগে চলে আসার পিছনে কেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। ওর অনুপ্রেরণাই আজ ওকে এত সাহস-উদ্দীপনা জুগিয়েছে। ওর শুধু একটাই চিন্তা, ওর ফরেন স্টের সময়, কেয়া এত-সব কি করে সামলাবে। ছ'মাস বাদে মেয়ের স্কুলে ভর্তি, নতুন ফ্ল্যাট-টায় গিয়ে তদারকি করা, আরও কত কি! অমিত কিছু বলার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারল না। ওর শুধু একটা কথাই বার বার মনে আসছিল। কেয়া যেন ওকে ভুল না বোঝে। ট্রেনটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। কেয়া জানালার বাইরে দেখার চেষ্টা করল, কোন স্টেশন এসেছে কিনা। ট্রেনটা সিগন্যাল পায়নি বলেই থেমেছিল। ট্রেনটার ক্যাচ-ক্যাচ আওয়াজ করে থেমে যাওয়াতে পিউ-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও মাকে খুঁজছিল। কাছে না পেয়ে উঠে বসল। সামনেই মা-বাবাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল। অমিত ওকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল। কম্বলটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিল। পিউ মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল –"তোমরা অনেকক্ষণ উঠে গেছ?" অমিত ওর গালটা টিপে আদর করে বলল –"এই একটু আগেই উঠেছিলাম।" কেয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল –"না-রে, তোর বাপি আমার আগেও উঠে চিল্কা লেক দেখছিল একা-একা। আমাকেও জাগায় নি তখন!"

অমিত বেশ বুঝতে পারছিল যে কেয়ার অভিমানটা অনেক পড়ে গেছে। কেয়ার এই বিশেষ গুণটা ওর খুব ভাল লাগত। ও ভেবে খুব অবাক হয়ে যেত, ও কি করে এটা পারত! কেয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল –"জানিস পিউ, তোর বাপি খুব শিগ্‌গিরই সিঙ্গাপুরে যাবে, অফিসের কাজে।" পিউ খুব খুশী হয়ে বলল – "তাই, বাপি! কি মজা, আমরা আবার বেড়াতে যাব!" পিউ 'সিঙ্গাপুর' বলতে কি বুঝল কে জানে। নিশ্চয়ই ভেবেছে, কলকাতার মতই কোন জায়গা হবে। আর ট্রেনে করে যেতে হয়। কেয়া ওর আনন্দটাকে মাটি না করে বলল – "তোর বাপি এখন অফিসের কাজে একা যাবে। হয়ত পরে আমাদেরকেও নিয়ে যাবে।" পিউ মার কথা শুনে বলল –"ও, তাই!" কেয়া যে এভাবে পিউকে সামলে নেবে, অমিতের ধারনার বাইরে ছিল। ওর হঠাৎই সেই কথাটা মনে পড়ে গেল যেটা ওর বাবা মাঝে মাঝে বলতেন – "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।" এই কথাটা যে কতটাই সত্যি, কেয়া ওর জীবনে না থাকলে ও বুঝতেই পারত না হয়ত কোনদিন।

* * * * *

হে কবি প্রণমি তোমায়

জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

কবিগুরুকে নিয়ে শুরু করি আমার লেখা। আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ শততলার মানুষ আর আমি একতলার মানুষ। আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে আছেন তিনি হয় বাঁধানো ফ্রেমে তা নাহলে ক্যালেন্ডারে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত রবি কে আমরা নব নব রূপে পেয়ে থাকি। কখনো বাউল রবি, কখনো প্রেমিক রবি, আবার কখনো প্রৌঢ় রবি আর তরুণ রবি তো রূপস যুবা। আমি মনে করি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি রত্নভাণ্ডার। তাঁর ঝাঁপি খুললেই বেরিয়ে আসে মণি মাণিক্য। আমার মনে হয় পৃথিবীর যে কোন গুণী মানুষের চেয়ে সমস্ত দিক থেকে পূর্ণতার অভিলাষী রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেউ নেই।

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে দেখে বলেছিলেন ‘কী সুষমা’। ‘সু-সম’ থেকে তো সুষমা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবদিকই সুন্দরভাবে সমান। লেখায়, আঁকায়, গানে, নৃত্যে, কবিতায়, জীবনযাপনে, স্বদেশভাবনায়, বিশ্বভাবনায় এমন সব্যসাচী তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি যখন আর্জেন্টিনায় গেছলেন তখন সেখানকার এক মহিলা দর্জি রবীন্দ্রনাথের একটা পোষাক বানিয়ে দিতে চাইছিলেন এই জন্যে যে মাপ নিতে গিয়ে এই সুন্দর মানুষটিকে তিনি একবার স্পর্শ করতে পারবেন।

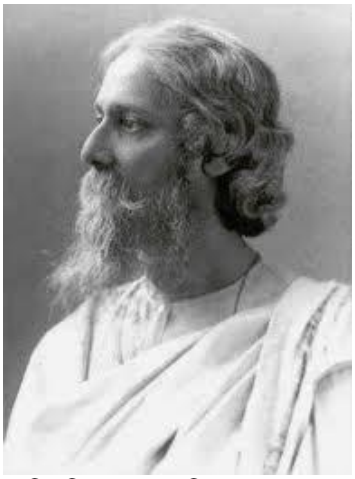

আমরা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ মানব বলতে পারি। পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি কিন্তু সেগুলির প্রতিটিই অচেতন, জড়। পৃথিবীর সচেতন বিস্ময় রবীন্দ্রনাথকে জানলে মনে হয় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বোধহয় তিনিই।

শো-কেসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ, ফটোয় বাঁধানো রবীন্দ্রনাথ, বইয়ের পাতায় রবীন্দ্রনাথ আর আমাদের স্বপ্নে দেখা রবীন্দ্রনাথ সব দিকে পূর্ণ তিনি, তাই তিনি সুন্দর।

এই শ্রেষ্ঠ, সুন্দর মানুষ প্রবলভাবে জীবিত আছে আমাদের মধ্যে আর থাকবে চিরকাল, চিরদিন। হে কবি বারে বারে প্রণাম জানাই তোমায়।

* * * * *

ক্লোজ এনকাউন্টারস – ফোর্থ কাইন্ড

পুণ্যজিৎ গুপ্ত

বিষ্ণু বলিলেন – নারদ, উই গো আর্থ।

নারদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। এই ইংরাজি ভাষায় কথা বলিবার আবেগ বিষ্ণুর সম্প্রতি উদ্ভব হইয়াছে। ইহার জন্য অবশ্যই দায়ী যীশু। মাসাধিককাল পূর্বে তিনি হজরত মহম্মদকে বগলদাবা করিয়া আসিয়াছিলেন – তিন দিকপালের সামিট মিটিং সারিতে। মিটিংএ ভ্যারেণ্ডা ভাজা ছাড়া বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। তবে বিষ্ণু হাই, হ্যালো, ডুড, ইত্যাদি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং এই যবন ভাষাটি রপ্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। ফলত: স্বর্গবাসী প্রত্যেক দেবদেবী বিগত একমাস ধরিয়া দিবারাত্র এক বিচিত্র ইংরাজি ভাষার তাড়না ভোগ করিতেছেন। সান্ত্বনা এই যে হেভেন এও সেইন্ট পিটারাদি ততোধিক বিচিত্র সংস্কৃত ভাষার শিকার হইয়াছেন। কালচারাল এক্সচেঞ্জ এর পরাকাষ্ঠা।

যাহা হউক, প্রভুর শখ একটা কিছু হইয়াছে, তাহার বিহিত করা আবশ্যক। নারদ বলিলেন – প্রভু, যখন সিরিয়াস কথা বলিবেন তখন অপূর্ব রায় মার্কা ইংরাজিটি ব্যবহার না করিলেই সুবিধা হয়। আমি ঠিকমত বুঝিতে না পারিলে আপনিই ভুগিবেন।

বিষ্ণু ব্যথিত দৃষ্টিতে চারিপাশে তাকাইলেন। লক্ষ্মীদেবীর ঠোঁটের কোনে সামান্য হাসি দেখিয়া বুঝিলেন যে এই পরিস্থিতিতে এই স্বর্গীয় ভাষাটিকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখাই শ্রেয়।

বলিলেন, ওকে, মানে ঠিক আছে। তোমাদের পক্ষে যখন এই ভাষা এতই দুরূহ তখন আমি নেটিভ ভাষাই প্রয়োগ করিতেছি। একবার মর্ত্যে যাওয়া প্রয়োজন। আই মিন আমার ইচ্ছা করিতেছে।

নারদ কহিলেন – প্রভু জানেন যে মর্ত্যবাসী ইদানীং আপনাদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। তবে এই বেয়াড়া শখ কেন?
বিষ্ণু – ব্যাটাদের রোয়াব এত বাড়িল কি করিয়া? মাত্র চারিপাঁচশত বৎসর পূর্বেও তো ধুমধাম করিয়া পূজা করিত। আর এখনও তো শুনি কোন এক নগরে আড়ম্বর করিয়া দধিভাণ্ড ফাটানোর অনুষ্ঠান হয়।

নারদ – প্রভু উল্লসিত হইবার কোন হেতু নাই। উক্ত আড়ম্বরের নিমিত্ত আপনি নন। গোবিন্দা, সলমন খান ইত্যাদি সেলিব্রিটিরাই এই অনুষ্ঠানের মাহাত্য বাড়াইয়াছেন। জনতা তাহাদের জন্যই উন্মাদ।

বিষ্ণু সদ্য জ্ঞানার্জিত ইংরাজি ভাষায় একটি চারিবর্ণের শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

নারদ বলিলেন, প্রভু এই শতাব্দী সেলিব্রিটিদের কব্জাগত। ইহাদের পূজা করিতেই পাবলিক ব্যস্ত। আপনাদের হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই চাপিয়া রাখা ছাড়া আপাতত দ্বিতীয় কোন বিকল্প দেখি না।

বিষ্ণু বলিলেন – এই সেলিব্রিটি ব্যাপারটি কবে পয়দা হইল? পূর্বে তো গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী ইহাদেরই জয়জয়কার ছিল।

নারদ – প্রভু কোন শতাব্দীতে পড়িয়া আছেন? আপনাদের ন্যায় উহারাও আজ জনতার কাছে অপাংক্তেয়। অদ্যযুগে সেলিব্রিটির ব্যাখ্যা অন্য। চলচ্চিত্রের রঙিন পর্দায়, ক্রিকেট খেলার মাঠে তথা রাজনীতির পঙ্কিল ক্ষেত্রে ইহাদের নানাবিধ কীর্তি এবং কুকীর্তির মাধ্যমেই এই শ্রেণীটির রমরমা এবং প্রাধান্য।

বিষ্ণু - মর্ত্যে ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে?
নারদ - প্রভুর বাই যখন উঠিয়াছে, তখন কিছু একটা ব্যবস্থা করিতে হয়। উই গো আর্থ।

- ২ -

বিষ্ণু ও নারদ মুম্বাই আসিয়াছেন। তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী সর্বাধিক সেলিব্রিটি এই নগরীতেই বিদ্যমান। সৌভাগ্যবশত ভিডিওকন ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড এই সময়েই শিডিউলড ছিল। সুতরাং পরিচয়পর্ব সারিতে বেশী ঘোরাঘুরির প্রয়োজন হইবে না - তাবড় তাবড় সেলিব্রিটিকে এই অনুষ্ঠানেই দেখা যাইবে।

বিষ্ণু কহিলেন - ওহে নারদ, তুমি নিশ্চিত যে আমরা মর্ত্যেই আসিয়াছি? ইহা 'ত' স্বর্গ বলিয়াই বোধ হইতেছে।
নারদ - প্রভু, গাঁইয়ামি বন্ধ রাখুন। মর্ত্যলোক অধুনা স্বর্গ হইতে অনেকাংশে মনোরম। খাদ্য, পানীয় তথা অন্যান্য জৈবিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডারের তুলনা করিলে মর্ত্যের আর স্বর্গের পার্থক্য নিউইয়র্ক আর বৈঁচিগ্রামের মতই।

বিষ্ণু - বেশ, বেশ। এই বৃহৎ সভায় আপাতত কি ঘটিবে?
নারদ - ধৈর্য ধরুন। সেলিব্রিটিরা আসিতেছেন। পরিচয় করাইয়া দিব।
সহসা সভাস্থলে চাঞ্চল্য ও কোলাহলের জাগরণ ঘটিল। জনতা উন্মাদের মত দৌড়াদৌড়ি শুরু করিল।
বিষ্ণু - কি হইল? এত কোলাহল কিসের?
নারদ - অমিতাভ বচ্চন আসিয়াছেন।
বিষ্ণু - ইনি কে?
নারদ - একসময়ে সম্পর্কে উনি সকলের পিতা ছিলেন, তখন শাহেনশা নামে খ্যাত ছিলেন। তাহার পর অনেক নাম ও খেতাব অর্জন করিয়াছেন। এখন বিগ বি নামে পরিচিত।
বিষ্ণু - সঙ্গে গৌরবর্ণা সুন্দরীটি কে? আহা কি মনোরম মুখভঙ্গিমা, কি অপরূপ দেহ সৌষ্ঠব, কি .....
নারদ - প্রভু চিত্ত সংযত রাখুন, এত উতলা হইবেন না। উনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, আরাধ্যার জননী ও বিগ বি এর পুত্রবধূ।
বিষ্ণু - বিবাহ হইয়া গিয়াছে? আচ্ছা ঠিক আছে। স্বামীর নাম কি?
নারদ - নো আইডিয়া সারজি। কিছু একটা বচ্চন হইবে।

সভার কোলাহল বাড়িতে থাকিল। একে একে সব দিকপালেরা আসিতেছেন। বিষ্ণু কনফিউজড। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবেন? প্রশ্ন করিলেন - আচ্ছা, ওই নানাবিধ অলংকারে বিভূষিত মহিলাটি পুরুষের মত পোষাকে কেন ঘুরিতেছেন?

নারদ - প্রভু উনি বাপ্পি লাহিড়ী এবং উনি পুরুষ। গহনাগাঁটি ওনার শখ। একটি মঙ্গলসূত্রও প্রস্তুত করাইতেছেন।
বিষ্ণু - উনি কে? থাকিয়া থাকিয়া সারমেয়দের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন কেন?
নারদ - উনি ধর্মেন্দ্র। ম্যায় তেরা খুন পি যাউঙ্গা কুত্তে বলিতে বলিতে সারমেয় রক্তের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন।
বিষ্ণু - সঙ্গে বলিষ্ঠদেহ পুরুষটি কে?
নারদ - ওনার সন্তান, সানি দেওল। একসময়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করিতেন। এখন ভারত সরকারের পুরাতন টিউবওয়েল উৎখাত প্রোজেক্ট এর প্রধান কর্মকর্তা।
সভাস্থলে চাঞ্চল্য বাড়িল। সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিষ্ণু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন।
বিষ্ণু - এই অভিজাত সভায় ভিখারিনীর আগমন কেন? আহা, পরিধানবস্ত্রও ভাল করিয়া জোটে নাই। তবে চেহারা বড়ই চিত্তাকর্ষক।
নারদ - প্রভু চঞ্চল হইবেন না। ঘাড় ঘুরাইয়া দেখারও প্রয়োজন নাই। উনি মল্লিকা শেরাবত। পরিধানবস্ত্রের প্রতি ওনার এ্যালার্জি সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি আত্মজীবনী লিখিয়াছেন - 'মাই ওয়ার্ডরোব দ্যাট নেভার ওয়াজ'।
বিষ্ণু - ঐ মার্জারাক্ষী দীর্ঘাঙ্গী যুবতী কে? আর ঐ বালকটি তাহার দিকে আড়ে আড়ে তাকাইতেছে কেন?

নারদ – বালক নন – বালকসুলভ চেহারা মাত্র। ওনার নাম শহীদ কাপুর। একদা ঐ যুবতীর সহিত গাঢ় কেমিস্ট্রি বিদ্যমান ছিল। অধুনা ল্যাং খাইয়াছেন তবুও চিত্তদৌর্বল্য এখনও যায় নাই।
বিষ্ণু – আই সী। আর যুবতীটি?
নারদ – উনি কাপুর সাম্রাজ্যের তনয়া, নাম করিনা।
বিষ্ণু – কি হেতু? নাম করিতে অসুবিধা কোথায়?
নারদ – কি জ্বালা, ওনার নাম করিনা কাপুর। আর্যভট্টর পরে শূণ্যের মাহাত্য উনিই ভারতবাসীকে দ্বিতীয়বার উপলব্ধ করাইয়াছেন।
বিষ্ণু – মহৎ গণিতবিশারদ কি?
নারদ – আজ্ঞে, ঠিক গণিত নয়। অনেকটা বায়োলজি বলিতে পারেন। এখন মাথা খাইবেন না, পরে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিব।
বিষ্ণু – ওকে, ওকে। আচ্ছা ঐ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত খর্বকায় বৃদ্ধটি কে? মাথায় শিরস্ত্রাণ এবং হস্তে গদাসদৃশ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ঘুরিতেছেন কেন?
নারদ – আইলা। উনি শচীন তেন্ডুলকর। ক্রিকেটের ঈশ্বর। সাতষট্টি বৎসর ধরিয়া খেলিয়া যাইতেছেন। শেষ আড়াইশ টেস্ট ম্যাচে অ্যাভারেজ ২.৬৩। তবে এখনও ওনার ক্রিকেটক্ষুধা মেটে নাই। তাই চালাইয়া যাইতেছেন। পাছে লোকে রিটায়ার করিতে বলে, তাই সর্বদা ক্রিকেটের পরিধানে সজ্জিত হইয়া থাকেন।

সহসা সভাস্থলের কোলাহল থামিল। নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। বিষ্ণু দেখিলেন কয়েকশত সৈনিক পরিবৃত হইয়া এক পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে আগমন করিতেছেন। প্রশ্ন করিলেন ইহারা কারা?

নারদ – প্রভু, মর্ত্যে আগমন স্বার্থক হইয়াছে। ইহারা অধুনা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী। আপাতত এক মহান চলচ্চিত্রের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন – নাম হইল 'হাম ইন্ডিয়া লুট চুকে সনম'।

ঐ কঠোর মুখভাবধারিণী শ্বেতাঙ্গিনী হইলেন সোনিয়া গান্ধী এবং ঐ বশংবদভাবধারী নীলাভ উষ্ণীয় পরিহিত পুরুষটি মনমোহন সিং। এই জুটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ আজ বিশ্বে সর্বপ্রথম স্থান অর্জন করিয়াছে।

বিষ্ণু – বটে। কোন ক্ষেত্রে এই চমকপ্রদ সাফল্য জানিতে পারি কি?
নারদ- অবশ্যই। ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি ও ন্যায়শূণ্যতায়। সঙ্গে অরাজকতা, উৎকোচসেবন ও নারীনিগ্রহও যোগ করিতে পারেন।
বিষ্ণু – অনেক হইয়াছে। উই গো ব্যাক হেভেন।
নারদ – ওকে।

* * * * *

রান্নাঘর:-

কাঁচা পেপের শুক্তো

শ্রীমতী দেবযানী (মালা) রায়

উপকরণঃ –

কাঁচা পেপে – ৫০০ গ্রাম
নারকেল বাটা – আধমালা
পোস্তবাটা – ৩০ গ্রাম
দুধ – ২ পেয়ালা
আদাবাটা – ১ টেবিল চামচ
ঘি - ১ টেবিল চামচ
রাধুনীবাটা – আন্দাজমতো
নুন – আন্দাজমতো
চিনি – আন্দাজমতো
তেজপাতা – ২ টি
সাদাতেল - ১ টেবিল চামচ

প্রণালীঃ-

১/২" চওড়া ও ১" লম্বা পাতলা পাতলা করে পেপে ছুলে নিয়ে টুকরো করে কাটতে হবে। এরপর কড়াইতে সাদা তেল গরম করে রাঁধুনী ও তেজপাতা ফোঁড়ন দিয়ে পেঁপের টুকরোগুলো ছাড়তে হবে। অল্প ভাজা হলে এতে রাঁধুনীবাটা ও দুধ দিয়ে অল্প আঁচে সেদ্ধ করতে হবে। এরপর নারকেল, পোস্তবাটা, নুন, চিনি দিয়ে ভালকরে নাড়াচাড়া করে আদাবাটা দিয়ে মাখামাখা করে ঘি মিশিয়ে নামাতে হবে।
এতে জল মেশানো যাবে না, প্রয়োজনে দুধ ব্যাবহার করা যাবে।

* * * * *

কাঁচালঙ্কা মুরগি

জয়শ্রী কুন্ডু (রক্ষিত)

উপকরণঃ-

মুরগির মাংস – ১ কেজি
আদা বাটা – ৫০ গ্রাম
রসুন বাটা - ৫০ গ্রাম
পেঁয়াজ – ৪ টা
ধনেপাতার ডাঁটা ও পাতা কাটা – ৫ চামচ
সাদা তেল – আন্দাজমতো
কাঁচালঙ্কা – ১০০-১২৫ গ্রাম
তেজপাতা – ২ টো
ছোট ও বড় এলাচ - ২ টো
দারচিনি - ২ টো
নুন – আন্দাজমতো
চিনি – আন্দাজমতো

পদ্ধতিঃ-

প্রথমে পেঁয়াজকে লম্বা করে কুচিয়ে তেলে ব্রাউন করে ভেজে ঠান্ডা করে জল দিয়ে মিক্সিতে পেষ্ট করে নিতে হবে । এবার কাঁচালঙ্কাগুলিকে মাঝখানে কেটে বীজ গুলো বের করে গরমজলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পেষ্ট করতে হবে ।
কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে ওর মধ্যে গোটা গরমশালা ফোড়ন দিয়ে চিকেন গুলো দিতে হবে । এরপর ওর মধ্যে আদা, রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে কষতে হবে । কষা হলে ভাজা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে । এরপর ওর মধ্যে আন্দাজমতো নুন দিয়ে নেড়ে চাপা দিতে হবে ।
কিছুক্ষণ পর ঢাকাটা খুলে ওর মধ্যে ধনেপাতার ডাঁটা ও পাতা বাটা এবং কাঁচালঙ্কার পেষ্ট দিয়ে নেড়ে, আন্দাজমতো চিনি দিয়ে আবার ঢাকা দিতে হবে । ৫-৬ মিনিট পর ঢাকাটা খুলে নিতে হবে । চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে ।
গরম ভাতের সাথে বা রুটি বা পরোটাস সাথে পরিবেশন করতে হবে ।

* * * * *